ড. রামেশ্বর শ'

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান

ও

বাংলা ভাষা

হলমার্ক দেখে নেবেন
সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
কেনার সময়।

ডঃ রামেশ্বর শ'

এম. এ. : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (ভাষাবিজ্ঞান) ও বাংলা, পি-এইচ্ ডি.,
ডিপ্. ইন্ জার্মান

(বিশ্ববিদ্যালয়-স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত)

প্রাক্তন প্রফেসর্ : বাংলা বিভাগ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন গেস্ট্-লেক্চারার : বাংলা বিভাগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন ডীন্ : ফ্যাকাল্টী অফ্ আর্টস্ অ্যাণ্ড কমার্স্ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান : বাংলা বিভাগ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

39, Aziz Super Market
বিদিত
BIDITA
Tel: 9663474

সুতরাং 'কি'-এর উচ্চারণ এই রকম করলেও 'কোন্ বস্তু' (what) এই অর্থটি বোঝানো যায়, তার জন্যে 'কী'-এর উচ্চারণ সব সময় পৃথক্ হবেই এমন নয়।

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেও কেউ কেউ দৈর্ঘ্যকে স্বনিমীয় তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে বাংলায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জন হল দীর্ঘ ব্যঞ্জন ; হ্রস্ব ব্যঞ্জন (অর্থাৎ একক ব্যঞ্জন) ও দীর্ঘ ব্যঞ্জন (অর্থাৎ দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন)-এর মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে : যেমন—

'সবাই মিথ্যা কথা বলে' ;

'সব্বাই মিথ্যা কথা বলে' ;

এই দু'টি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যটি সাধারণ, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে জোর একটু বেশি। অর্থাৎ দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন 'ব্ব'-এর জন্যে অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য ঘটেছে। কিন্তু এখানেও অর্থের পার্থক্য ঘটেছে মূলত 'সব্বাই' শব্দে শ্বাসাঘাতের জন্যে, ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তির জন্যে নয় ; ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তি শ্বাসাঘাতের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তা ছাড়া দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনকে একক দীর্ঘ ব্যঞ্জন বলাও যায় না। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা ঠিকই ধরেছেন এসব ক্ষেত্রে দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনের দু'টি ব্যঞ্জনের মাঝখানে একটি অক্ষরগত ব্যবধান (syllable break) সংঘটিত হয়। যেমন 'সব্বাই'-এর উচ্চারণ ['সব্‌বাই'] = সব্ + বাই = দু'টি অক্ষর। দু'টি অক্ষরের দু'টি ধ্বনিকে একসঙ্গে নিয়ে একটি দীর্ঘ ধ্বনির মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ, বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, "দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ...একাত্মতাপ্রাপ্ত হয় না"।[৪৭] সুতরাং বাংলায় ঠিক ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বিচারে দীর্ঘ ব্যঞ্জন বলে কিছু নেই, তাই ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ কিনা সে প্রশ্নই অবান্তব।

॥ ১৮ ॥

রূপিম বা মূলরূপ ও রূপতত্ত্ব
(Morpheme and Morphology)

সাধারণত ব্যাকরণ (Grammar) কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে এর দু'টি বিভাগ নির্ণয় করা হয় : রূপতত্ত্ব (Morphology) এবং বাক্যতত্ত্ব (Syntax)। বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তার আগে রূপতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভাষার সবচেয়ে মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। পূর্ববর্তী একাধিক অধ্যায়ে আমরা এই ধ্বনির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে

৪৭। হাই, মুহম্মদ আবদুল : 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ঢাকা, ১৯৬৪ পৃ. ১৩৪

আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর যে এক-একটি অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে তা হল শব্দ (word)। এই শব্দের নানা দিক—তার গঠন, শ্রেণীবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ (প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি)—হল রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয়।

রূপিম বা মূলরূপ, শব্দ, অক্ষর (Morpheme, Word, Syllable) : রূপতত্ত্বের প্রাথমিক পরিচয়ের জন্যে আমরা যদিও বলি, ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর একক হল শব্দ (word) এবং মোটামুটিভাবে শব্দেরই বিভিন্ন দিক রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়, তবু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর এককটি শব্দ (word) নয়, সেটি হল রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme)।[৪৮]

এই প্রসঙ্গে তা হলে রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) কাকে বলে এবং শব্দ (Word) ও অক্ষরের (Syllable) সঙ্গে তার পার্থক্য কি সেইটা আগে বোঝা দরকার। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ মূলরূপ বা রূপিমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"Morphemes are generally short sequences of phonemes. These sequences are recurrent—but not all

---

৪৮। ইংরেজি 'Morpheme' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কেউ কেউ 'রূপমূল' কথাটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি-যুক্ত পদকে আমরা যথাক্রমে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ বলে থাকি। অর্থাৎ 'রূপ' বলতে বিভক্তিযুক্ত পদের রূপটিই আমাদের মনে ভেসে উঠে। তাই রূপমূল বললে এই বিভক্তিযুক্ত শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপের মূলটিকে বোঝাতে পারে, অর্থাৎ প্রাতিপদিক (Stem) ও ধাতুকে (Root) বোঝাতে পারে। কিন্তু Morpheme বলতে শুধু এই মূলকে বোঝায় না, বিভক্তিও Morpheme-এর মধ্যেই পড়ে এবং Morpheme কথাটি আরো ব্যাপক অর্থবহ। তাই Morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'রূপমূল' কথাটি গ্রহণ না করাই ভাল। 'রূপ' কথাটি সাধারণভাবে ধ্বনি-গঠিত রূপ (form) অর্থে গ্রহণ করে morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মূলরূপ' কথাটি গ্রহণ করা যায়। ভারত-সরকার কর্তৃক গঠিত Standing Commission for Scientific and Technical Terminology-র উদ্যোগে ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক রাবুরাম সক্সেনার অধ্যক্ষতায় ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক যে পরিভাষা নির্ণীত হয়েছে তাতে Morpheme-এর প্রতিশব্দ হল 'রূপিম'। এই প্রতিশব্দটিও গ্রহণীয় মনে হয়। 'Phoneme'-এর প্রতিশব্দ যেমন 'মূলধ্বনি' বা 'স্বনিম', তেমনি Morpheme-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মূলরূপ' বা 'রূপিম' গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়।

recurrent sequences are morphemes...Morphemes can be usefully described as the smallest meaningful units in the structure of the language."[৪৯] রূপতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ নিদা সংক্ষেপে বলেছেন—'minimal meaningful unit'-ই হল মূলরূপ বা রূপিম (Morpheme)[৫০]। এই দু'জন ভাষাবিজ্ঞানী মোটামুটি একই কথা বলেছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড্ আবার রূপিমের আর একটা দিক উল্লেখ করেছেন। তাঁর সংজ্ঞায়—"A linguistic form, which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form, is a *simple* form or *morpheme.*"[৫১] বলা বাহুল্য এই সংজ্ঞাগুলি কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এক-একটি সংজ্ঞায় রূপিমের এক-একটি দিকের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রূপিমের সব দিক মিলিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি : রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই। কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে রূপিম বা মূলরূপ হতে হলে তাকে চারটি সর্ত একই সঙ্গে পূরণ করতে হবে :

(১) সেটি এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক (unit) হওয়া চাই ;

(২) সেই এককটির একটি অর্থ থাকা চাই ;

(৩) সেই এককটি ভাষার মধ্যে বারবার ফিরে আসা চাই ; এবং

(৪) সেই এককটির অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না। যেমন—"মাতৃচরণে করি প্রণাম" এবং "আমি মায়ের চরণ দর্শন করতে এসেছি।" এখানে প্রথম বাক্যের 'মাতৃচরণ' শব্দের 'চরণ' অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের 'চরণ' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল আছে। যেহেতু প্রথম বাক্যের 'মাতৃচরণ' শব্দের অংশবিশেষের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের 'চরণ' শব্দের মিল আছে সেহেতু 'মাতৃচরণ' শব্দটি সবটা একটা রূপিম নয়। অর্থাৎ সহজ করে বলতে পারি, যদি কোনো শব্দের অংশবিশেষেরই একটি অর্থ থাকে অর্থাৎ

৪৯। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics.* Calcutta : Oxford & IBH Publishing Co., 1966, pp. 51-53.

৫০। Nida, Eugene A. : *Morphology,* Ann Arbor : The University of Michigan, 1965. p. 6.

৫১। Bloomfield, Leonard : *Language,* Delhi : Motilal Banarasi dass, 1963, p. 161.

অংশবিশেষই যদি একটি রূপিম হয় তবে গোটা শব্দটিকে একটিমাত্র রূপিম বলা যায় না। কারণ রূপিম হল অর্থযুক্ত অথচ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি।

কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উপরের চারটি সর্তই যদি পূরণ করে তবেই তাকে রূপিম বলা যাবে। কিন্তু কোনো ধ্বনিসমষ্টিকে 'শব্দ' (word) হতে হলে সর্বদা উপরি-উক্ত চারটি সর্তই পূরণ করতে হবে এমন নয়। প্রথম সর্তটি পূরণ না করলেও চলে। অর্থাৎ শব্দ হল এমন ধ্বনি-সমষ্টি যা অর্থপূর্ণ ও পৌনঃপুনিক, কিন্তু তা ক্ষুদ্রতম একক নাও হতে পারে। কিছু কিছু রূপিম আছে যা সর্বদা অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, একা ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন—'মানুষকে' শব্দের 'মানুষ' এবং '-কে' দুটি অংশই দু'টি রূপিম, কিন্তু '-কে' অংশটুকু একা ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য দিকে সব শব্দই একা ব্যবহৃত হতে পারে ; যে ধ্বনিসমষ্টি একা ব্যবহৃত হতে পারে না তা শব্দই নয়, যেমন—'মানুষ' একটি শব্দ, কিন্তু '—কে' একটি শব্দ নয় ; কারণ '-কে' একা ব্যবহৃত হতে পারে না।

বাংলায় 'আম' এই ধ্বনিসমষ্টি হচ্ছে এমন একটি অর্থপূর্ণ একক যাকে আর ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককে ভাগ করা যায় না, যদি জোর করে ভাগ করা হয় (যেমন—আ + ম) তাহলে এর যে দু'টি অংশ পাওয়া যাবে, তার কোনোটিরই কোনো মানে হবে না, অর্থাৎ একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্তটি পূরণ হবে না। এই জন্যে Bloch ও Trager-এর বক্তব্য হচ্ছে—

"Any form, whether free or bound, which cannot be divided into smaller meaningful parts is a MORPHEME".[৫২]

অতএব 'আ' বা 'ম' একা-একা কোনো রূপিম নয়, কিন্তু 'আম' হচ্ছে রূপিম। আবার 'আমসত্ত্ব' একটিমাত্র রূপিম নয়। কারণ এটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়। একে ক্ষুদ্রতর দু'টি অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিতে ভাগ করা যায়—'আম' ও 'সত্ত্ব'। এখানে দু'টি একক পাচ্ছি এবং দু'টিরই স্বতন্ত্র অর্থ আছে। এখানে 'আম' ও 'সত্ত্ব' হল দুটি রূপিম। তাহলে রূপিম হচ্ছে অর্থপূর্ণ এমন ধ্বনিসমষ্টি যা ক্ষুদ্রতম। কিন্তু শব্দ অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি হলেও তা সব সময় ক্ষুদ্রতম নয়, তা কখনো ক্ষুদ্রতম একক, কখনো বা ক্ষুদ্রতম নয়। যেমন—'আমসত্ত্ব' একটি রূপিম নয়, কিন্তু একটি শব্দ ; আবার বাংলায় 'আম'-ও একটি শব্দ, 'সত্ত্ব'-ও একটি শব্দ। অর্থাৎ শব্দ কখনো একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত হয়, কখনো বা একাধিক রূপিম নিয়েও গঠিত হয়।

৫২। Bloch, Bernard and Trager, George L : *Outlines of Linguistic Analysis,* New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1972, p. 54.

আবার 'আমের' শব্দটির দু'টি অংশ—'আম' এবং '-এর'। এই দু'টিই হল দু'টি রূপিম। কারণ দু'টিই ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি ও দু'টিরই কিছু-না-কিছু অর্থ আছে ; যদিও '-এর' রূপিমটির অর্থ আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু এটা নিজেরা মনে-মনে ঠিকই বুঝতে পারি যে, '-এর' অংশটিরও একটি অর্থ আছে, এই অংশটি সম্বন্ধপদের অর্থ বহন করে। তাহলে 'আমের' শব্দটিও দু'টি রূপিম নিয়ে গঠিত—'আম' এবং '-এর'। এই দু'টি রূপিমের মধ্যে 'আম' একা একা ব্যবহৃত হতে পারে ; কিন্তু '-এর' কখনো একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না, এটি সর্বদা অন্য রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন এখানে 'আম' শব্দের সঙ্গে '-এর' অংশটি যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি ইংরেজিতে 'kindly' শব্দে দু'টি রূপিম—'kind' ও '-ly'। এখানে 'kind' একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু -'ly' কখনো একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কিছু কিছু রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিছু কিছু রূপিম তা পারে না। এখানেও 'শব্দে'র (Word) সঙ্গে 'রূপিমে'র (Morpheme) একটা পার্থক্যের সূত্র পাওয়া যায় : সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সব রূপিম একা-একা ব্যবহৃত হতে পারে না। যেসব রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে সেসব রূপিম শব্দ বলে গৃহীত হতে পারে (যেমন—আম, kind ইত্যাদি) ; কিন্তু যেসব রূপিম একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না সেগুলি একা একা শব্দ বলে গৃহীতও হয় না (যেমন, বাংলা -এর ইংরেজি -ly ইত্যাদি)।

রূপিম হল ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু তাই বলে তাকে অক্ষর (syllable)-এর সঙ্গে এক করে ফেললে ভুল হবে। রূপিম হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ ঠিকই, কিন্তু তার একটি মোটামুটি অর্থ থাকা চাই। অন্যদিকে অক্ষরও ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু সব সময় তার অর্থ থাকবেই, এমন নয়। কোনো কোনো অক্ষরের (syllable) অর্থ থাকে, কোনো কোনো অক্ষরের থাকে না ; যে অক্ষরের একটি অর্থ হয়, তা অবশ্যই রূপিমের মর্যাদা পাবে ; তা অক্ষরও বটে, রূপিমও বটে। কিন্তু যে অক্ষরের কোনো অর্থ নেই, তা শুধুই অক্ষর, কিন্তু রূপিম নয়। যেমন—'ধাক্কা' শব্দে দু'টি অক্ষর—'ধাক্' এবং 'কা', দু'টিই অক্ষর, কিন্তু কোনোটিই রূপিম নয়। কারণ কোনোটিরই কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'হালচাল' শব্দেও দু'টি অক্ষর—'হাল' ও 'চাল'। দু'য়েরই কিছু-না-কিছু অর্থ আছে। রূপিম ও অক্ষরের মধ্যে আর একটা পার্থক্যের কথা মনে রাখা দরকার। অক্ষর (syllable) হল সর্বদা এমন ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ যা নিশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হতে পারে এবং যাতে মাত্র একটি স্বরধ্বনি থাকে। কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ হলেও সর্বদা তা এমন ক্ষুদ্রতম নয় যে নিশ্বাসের এক ধাক্কাতেই উচ্চারিত হবে এবং তাতে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকবে। রূপিম কখনো

অক্ষরের মতো ক্ষুদ্রতম হতেও পারে, কখনো নাও হতে পারে। আসল কথা রূপিম ক্ষুদ্রতম একক হবে ঠিকই, কিন্তু দেখতে হবে ক্ষুদ্রতম একক হতে গিয়ে সেটা যেন একেবারে অর্থহীন না হয়ে যায়। অর্থাৎ রূপিম নির্ণয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এগোতে গিয়ে যখন দেখা যাবে যে আরো ক্ষুদ্র একক নির্ণয় করলে তার কোনো অর্থ হয় না তখন সেইখানে থেমে যেতে হবে। শেষ ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হল রূপিম। এরকম একটা রূপিম সর্বদা এক অক্ষরে গঠিত হবেই এমন নয়। কখনো কখনো একাধিক অক্ষরে গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক অর্থাৎ রূপিম পাওয়া যায়। যেমন—'হাল্‌কা' একটি রূপিম, এটি দু'টি অক্ষরে গঠিত (হাল্ + কা)। আবার কখনো একটি অক্ষরেই একটি রূপিম গঠিত হতে পারে। যেমন—'মা'।

উপরে গ্লীসন-প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে রূপিম হল পৌনঃপুনিক (recurrent) ধ্বনিসমষ্টি। এর অর্থ হল ভাষার মধ্যে তার ব্যবহার বারবার ফিরে আসে, একই রূপিম একা একা বা অন্য বিভিন্ন রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার ব্যবহৃত হয়। যেমন—'আমের' শব্দের 'আম' ও '-এর' কিংবা 'Kindly' শব্দের 'Kind' ও '-ly'। 'আম' ও 'Kind' তো ভাষার মধ্যে একটা বাক্য কিংবা একটা প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য বাক্য বা অন্য প্রসঙ্গেও খুবই ব্যবহৃত হয়। তেমনি—'-এর' এবং '-ly'ও অন্যান্য শব্দের সঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন—'জামের' (জাম + এর), frankly (frank + ly)। কিন্তু এমন কিছু কিছু শব্দাংশ পাওয়া যায় যা ক্ষুদ্রতম এবং অর্থপূর্ণ কিন্তু পৌনঃপুনিক নয়, অর্থাৎ যাকে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এ রকমের রূপিমকে অনন্যসাধারণ রূপিম (Unique Morpheme) বলে। যেমন—ভাষাবিজ্ঞানী হকেট্ একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন—ইংরেজি 'cranberry' শব্দের দু'টি অংশ 'cran' ও 'berry'। এদের মধ্যে 'berry'-কে 'cran' ছাড়া অন্য শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন—'blackberry' শব্দে। কিন্তু 'cran' অংশটিকে কখনো অন্য শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অথচ এই শব্দাংশটির একটি অস্পষ্ট অর্থও আমাদের মনে উঁকি দেয়, এটি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি নয়। কারণ, blackberry অর্থ কালোজাম, cranberry অর্থ লালজাম। এখানে বোঝা যাচ্ছে berry অর্থ জাম, তাহলে 'cran'—অর্থ 'লাল' হতে পারে। অথচ এই 'cran'-শব্দাংশটি অন্য শব্দের সঙ্গে কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না, এটি শুধু berry শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হয়। কখনো আমরা 'লালবাতি' অর্থে cranlight ব্যবহার করি না। 'cran'-এর মতো যেসব শব্দের ব্যবহার মাত্র একটি সমন্বয়ে সীমাবদ্ধ তাদেরই অনন্যসাধারণ রূপিম বা Unique Morpheme বলে।

॥ ১৯ ॥

রূপিম বা মূলরূপ সনাক্তকরণ
(Identification of Morphemes)

আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে যে-কোনো ভাষার আসল রূপ হল সেই ভাষাভাষী জনসমাজে প্রচলিত জীবন্ত ভাষা। তাই লিখিত ভাষার রূপ নয়, লোকমুখে প্রচলিত বাস্তব ব্যবহারের ভাষার রূপ নিয়ে তা থেকে যেমন কোনো ভাষার মূলধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme) বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি তার শব্দগঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার রূপিম (Morpheme) নির্ণয় করা হয়। তাই কোনো ভাষার রূপিম সনাক্তকরণের প্রথম ধাপ হল সেই ভাষায় ব্যবহৃত বাস্তব রূপের নমুনা তুলে আনা।

কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে এনে তা-ই থেকে সেই ভাষার ক্ষুদ্রতম মূল উপাদান স্বনিম (phoneme) নির্ণয় করা হয়, তেমনি ভাষার পরবর্তী বৃহত্তর উপাদান রূপিমও (morpheme) নির্ণয় করা হয়। তবে স্বনিম নির্ণয় ও রূপিম নির্ণয়ের পদ্ধতির মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু পার্থক্যও আছে। উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার সংগৃহীত নমুনা থেকে দুই বা ততোধিক শব্দ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে তুলনা করা হয়। স্বনিম নির্ণয়ের সময় পারস্পরিক তুলনার জন্যে এমন একাধিক শব্দ বাছা হয় যেগুলি হল যথাসাধ্য ছোট শব্দ এবং যাদের মধ্যে সব দিক থেকে মিল আছে, কেবল একটি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। এ রকমের শব্দের মধ্যে যে ধ্বনির পার্থক্য হয় সেই ধ্বনিটিকেই স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে গ্রহণ করা হয়। কারণ সেই ধ্বনিটির জন্যে শব্দগুলির অর্থ পৃথক্ হয়, কিন্তু এককভাবে সেই ধ্বনিগুলির নিজস্ব অর্থ থাকে না। যেমন—'কাল' ও 'খাল' শব্দের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেল শব্দ দুটির মধ্যে শুধু 'ক্' ও 'খ্'-এর পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্যেই শব্দ দু'টি পৃথক্ শব্দ হয়ে গেছে এবং শব্দ দু'টির অর্থ পৃথক্ হয়ে গেছে। কিন্তু 'ক্' বা 'খ্'-এর কোনো স্বতন্ত্র অর্থ নেই। অন্যদিকে রূপিম-নির্ণয়ের সময় যে শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হয়, সেগুলিকে যথাসাধ্য ছোট শব্দ হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার পরে শব্দ দু'টির মধ্যে তুলনা করে এখানে পার্থক্যটা খুঁজে বের করা হয় না, সাদৃশ্য কতটুকু সেইটা খুঁজে বের করা হয়। তারপরে দেখা হয়, শব্দ দু'টির সদৃশ অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সাদৃশ্য সেই সাদৃশ্য একই সঙ্গে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য কি না। যদি উভয়বিধ সাদৃশ্য থাকে তা হলে সেই সাদৃশ্যযুক্ত অংশটিকেই একটি রূপিম বলে গ্রহণ করা হয়। তবে যে শব্দ দু'টির মধ্যে তুলনা

করে সাদৃশ্যযুক্ত অংশটুকু বের করা হল সেই শব্দ দু'টি ক্ষুদ্রতম শব্দ না হলেও চলবে, তবে সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটুকু বের করা হয় সেই অংশটুকু অর্থপূর্ণ অথচ ক্ষুদ্রতম অংশ হওয়া চাই। 'কাচের' (কাচ্ + এর) ও 'খালের' (খাল্ + এর) এই দু'টি শব্দের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে দেখা গেল যে, দু'টি শব্দের মধ্যে শুধু '-এর' অংশটুকুতে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের অংশটুকুই বেছে নেওয়া হল এবং দেখা গেল দু'ই শব্দেই '-এর' অংশটুকুর অর্থ একই : দুই শব্দেই একটা সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং '-এর' হল একটি রূপিম। স্বনিম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে স্বনিমটি পাওয়া যায় তার একার নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না, কিন্তু রূপিম নির্ণয়ের সময় বরং দেখা হয় যে তার যেন একটা নিজস্ব অর্থ থাকে। স্বনিম হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান, কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম উপাদান নাও হতে পারে। স্বনিম ও রূপিমের স্বরূপ ও তাদের নির্ণয়-পদ্ধতির এই মূল পার্থক্যের কথা মনে রেখে আমরা এবার রূপিম নির্ণয়ের পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান সূত্রের কথা আলোচনা করতে পারি।

কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে আনার পর তা থেকে তার রূপিম বা মূলরূপ নির্ণয় করার জন্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। এইসব পদ্ধতির মধ্যে যেটি প্রধান তা হল গ্লীসনের ভাষায় :

> "Morphemes can be identified only by comparing various samples of a language. If two or more samples can be found in which there is some feature of expression which all share and some feature of content which all hold in common, then one requirement is met, and these samples may be tentatively identified as a morpheme."[৫৩]

এইটি নিদা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন রূপিম সনাক্তকরণের প্রথম সূত্রে :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness and an identical phonemic form in all their occurrences constitute a single morpheme."[৫৪]

৫৩। Gleason, H. A. [Jr.] *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Co., 1966. p. 56,

৫৪। Nida, Eugene A. : *Morphology*, Ann Arbor : The University of Michigan, 1965, p. 7

অর্থাৎ, ভাষার সংগৃহীত উপাদানের দু'টি ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে যদি ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকে তবে তাদের একটি রূপিম বলে চিহ্নিত করা যায়। যেসব রূপের (ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা গঠিত রূপের) অর্থ সুস্পষ্টভাবে এক এবং যাদের মধ্যে স্বনিমগত সাদৃশ্য আছে তারা একই রূপিম (Morpheme) বলে বিবেচিত হবে। ভাষায় তারা যতবার ব্যবহৃত হোক না কেন, তাদের মধ্যে উপধ্বনিগত অল্পস্বল্প পার্থক্য থাকলেও মূলধ্বনি তাদের একই রকম থাকতে হবে। যেমন —'জ্ঞাতা', 'দাতা', 'কর্তা' শব্দে '-তা' ব্যবহৃত হয়েছে। এই তিনটি শব্দের তুলনা করে বোঝা যায় তিন '-তা'-এর অর্থ সুস্পষ্টভাবে এক। কারণ তিনটি ক্ষেত্রেই এতে ক্রিয়ার কর্তাকে বোঝাচ্ছে--জ্ঞাতা = যে জানে, দাতা = যে দান করে, কর্তা = যে কাজ করে। এই তিনটি ক্রিয়ার অর্থ পৃথক্। কিন্তু '-তা'-এর দ্বারা তিনটি ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের যে বোধ জাগছে সেই কর্তৃত্বের বোধে সাদৃশ্য আছে। সেটা অর্থগত সাদৃশ্য। আর তিনটি শব্দের '-তা' অংশের মধ্যে ধ্বনিগত অভিন্নতা তো দেখাই যাচ্ছে। সুতরাং '-তা' হল একটি রূপিম। তেমনি ইংরেজি doing, running, working শব্দে যে তিনটি '-ing' আছে তাদের মধ্যে অর্থগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে ; সুতরাং '-ing' হল ইংরেজিতে একটি রূপিম।

কিন্তু যদি একাধিক রূপের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে এবং অর্থগত সাদৃশ্য না থাকে তা হলে তারা একই রূপিম নয়। যেমন 'আতা', 'দাতা', 'লতা' শব্দের তিনটি '-তা'-এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তিনটি--'-তা' এখানে একই তাৎপর্য বহন করছে না, সুতরাং '-তা' এখানে একটি রূপিম নয়। তেমনি ইংরেজি darkling, sing ও spring শব্দের তিনটি--'-ing'-এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সুস্পষ্ট অর্থগত কোনো সাদৃশ্য নেই, সুতরাং '-ing' এখানে একটি রূপিম নয়।

আবার 'হরিশ্চন্দ্র দাতা ছিলেন', 'কর্ণও দাতা ছিলেন'—এই দুই বাক্যে যে দু'টি 'দাতা' শব্দ, সেই দু'টিকে একটা রূপিম মনে হতে পারে, কারণ দুই বাক্যের 'দাতা' শব্দে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'দাতা'-কে এখানে একটিমাত্র রূপিম বলা যাবে না। কারণ রূপিমের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে যে রূপিম হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ। 'দাতা'-কে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ বলা যায় না। কারণ একে ক্ষুদ্রতম অথচ অর্থপূর্ণ দুটি ধ্বনিগুচ্ছে ভাগ করা যায়—'দা' ধাতু (অর্থ 'দেওয়া') এবং 'তা' প্রত্যয় (অর্থ 'দেওয়া কাজটি যে করে, সে', অর্থাৎ কর্তা, 'agentive suffix')। সুতরাং রূপিম নির্ণয়ের সময় শব্দকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র অথচ অর্থপূর্ণ এককে ভাগ করে নিতে হবে। যে শব্দকে এরকম ছোট ছোট এককে ভাগ করা যাবে, বুঝতে হবে সে শব্দটি একাধিক রূপিম নিয়ে গঠিত। কিন্তু যে শব্দকে আর তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর এককে ভাগ করা যাবে না, সে শব্দটি

একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত, যেমন—না, যা।

রূপিম নির্ণয়ের সময় ক্রমশ অধিক-সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করতে হয়। এভাবে তুলনা করতে করতে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্যসূচক অংশের আয়তন বাড়তে থাকে এবং সাদৃশ্যযুক্ত অংশটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে। এইভাবে যথাসম্ভব অধিক-সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করে শব্দগুলির মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটি পাওয়া যায় সেইটাই হল একটা রূপিম (Morpheme)। যেমন— প্রথমে আমরা শুধু তিনটি শব্দের মধ্যে তুলনা করি—

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি শব্দের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত অংশ হল 'দাতা'। সুতরাং মনে হতে পারে 'দাতা' একটা রূপিম বা মূলরূপ। কিন্তু যদি এই শব্দগুলির সঙ্গে আরো বেশি শব্দ মিলিয়ে নিয়ে তুলনা করি—

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

গৃহকর্তা

তাহলে দেখা যাবে শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ বেড়েছে। পার্থক্যের অংশগুলি বাদ দিলে সাদৃশ্যযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছ পাওয়া যাচ্ছে শুধু '-তা'। এইভাবে ক্রমশ অধিকতর শব্দের মধ্যে তুলনা করে অর্থগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটি পাওয়া যায় তাই হল রূপিম। যেমন--উপরের উদাহরণে '-তা' হল একটি রূপিম। যত বেশি শব্দের মধ্যে তুলনা করা হবে রূপিম নির্ণয় ততই নির্ভুল হবে।

নিদার দ্বিতীয় সূত্র :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in phonemic form (i. e. the phonemes or order of the phonemes) may constitute a morpheme provided the distribution of formal differences is phonologically definable."[৫৫]

যেসব ধ্বনিসংগঠনের মধ্যে সুস্পষ্ট অর্থগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু যাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত পার্থক্য আছে সেসব ধ্বনিসংগঠনকেও একই রূপিম ধরা হবে

৫৫। Ibid., p. 14.

যদি তাদের পারস্পরিক ধ্বনিগত পার্থক্যকে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করে দেখানো যায় যে, যে দু'টি ধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য চোখে পড়ছে, সে ধ্বনি দু'টি মূলত একই ধ্বনি ছিল, সুনির্দিষ্ট কারণে পরিবর্তিত হয়ে তারা পৃথক্ রূপ ধারণ করেছে। যেমন—'সন্ত্রাস', 'সম্পূর্ণ' ও 'সঙ্কোচন' শব্দে একটা অর্থগত মিল আছে, সেই মিলটা পরিপূর্ণতার মিল, তিনটি শব্দেই একটি পরিপূর্ণতার ভাব আছে। 'সন্ত্রাস' শব্দে বোঝাচ্ছে 'ত্রাস', যেন একটু-আধটু ত্রাস (ভয়) নয়, ব্যাপক ত্রাস। তেমনি 'সম্পূর্ণ' শব্দে যেন কোনো-রকমে পূর্ণ বোঝাচ্ছে না, একেবারে পূর্ণ বোঝাচ্ছে। তেমনি আবার 'সঙ্কোচন' শব্দে একটু কুঞ্চন নয়, সম্পূর্ণ কুঞ্চন বোঝাচ্ছে। এই তিনটি শব্দের প্রথমাংশ যথাক্রমে 'সন্', 'সম্' ও 'সঙ্'-এ এই পরিপূর্ণতার ভাবটি রয়েছে। এদের মধ্যে এই অর্থগত মিল আছে। কিন্তু ধ্বনিগত মিল তো পুরোপুরি নেই। তাহলে 'সন্', 'সম্' ও 'সঙ্'কে কি একই রূপিম বলা যাবে? এখানে পার্থক্য হচ্ছে 'ন্', 'ম্', এবং 'ঙ্' ধ্বনিতে। একটু তলিয়ে দেখলে অনুমান করতে কষ্ট হবে না যে, এগুলি মূলে একই ধ্বনি ছিল—মূল রূপটি ছিল 'সম্'। এর 'ম্' পৃথক্ হয়েছে পরবর্তী কোনো ধ্বনির প্রভাবে। এই 'ম্' 'সন্ত্রাস'-এ দন্ত্য ধ্বনি 'ত'-এর প্রভাবে দন্ত্য 'ন' হয়েছে ; 'সম্পূর্ণ'-এর ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'প্'-এর প্রভাবে ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'ম্'-তে পরিণত হয়েছে, 'সঙ্কোচনে' তেমনি স্নিগ্ধ-তালব্য ধ্বনি 'ক্'-এর প্রভাবে স্নিগ্ধ-তালব্য নাসিক্য ধ্বনি 'ঙ্'-কে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে 'সম্' উপসর্গটি তিনটি শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে তিনরকম রূপ লাভ করেছে—'সন্' 'সম্' ও 'সঙ্'। সুতরাং সন্, সম্ ও সঙ্-এর মধ্যে যে ধ্বনিগত পার্থক্য আছে তা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রে ব্যাখ্যা করে দেখানো যাচ্ছে যে এই পার্থক্য বাহ্য পার্থক্য, গভীরতর ক্ষেত্রে এই তিনটি একই স্বনিম। সুতরাং এই তিনটি (সন্, সম্, সঙ্) হল একই রূপিমের উপরূপ (Allomorph)। কারণ এদের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে, আর মোটামুটি ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। যেটুকু ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, সেটুকু সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তেমনি ইংরেজি intolerable ও impractical শব্দের 'in-' ও 'im-' হল একই রূপিম।

নিদার তৃতীয় সূত্র :

> "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in phonemic form in such a way that their distribution cannot be phonologically defined constitute a single morpheme if the forms are in complementary distribution...."[৫৬]

৫৬। Ibid., p. 41.

যেসব ধ্বনিসংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক অর্থগত সাদৃশ্য আছে অথচ স্বনিমগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং সেটা ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মূলীভূত সাদৃশ্য দেখানো যায় না, তারাও একই রূপিম হতে পারে যদি দেখা যায় যে তারা পরিপূরক অবস্থানে (Complimentary distribution) রয়েছে, অর্থাৎ একটির স্থানে অন্যটি বসতে পারে না। যেমন—বাংলায় কোকিলা, সাধিকা, ময়ূরী, রুদ্রাণী শব্দগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় যথাক্রমে -আ, -ইকা, -ঈ, -আনী। এদের মধ্যে স্বনিমগত বা ধ্বনিতাগত সাদৃশ্য নেই। তবু এরা একই রূপিম। কারণ এদের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে। এরা সবাই একই অর্থ বহন করে—স্ত্রীবাচক অর্থ। এদের একটি অন্যটির জায়গায় বসতে পারে না ; যেমন ময়ূরের সঙ্গে '-আনী' প্রত্যয় যোগ হবে না, তেমনি রুদ্রের সঙ্গে '-ঈ' প্রত্যয় যোগ হবে না। এবার ইংরেজিতে বহুবচনাত্মক চারটি পদ দেখা যাক—Cats, Crosses, Toys, Oxen, Deer—এইসব পদে বহুবচন-প্রত্যয় হল—যথাক্রমে -s/s/, -es/es, -s/z/, -en/en/ এবং শূন্য (Zero) প্রত্যয়। তাহলে এই চারটি প্রত্যয়ই এক অর্থ বহন করে—বহুবচনের অর্থ। কিন্তু এদের মধ্যে স্বনিম বা ধ্বনিতাগত মিল নেই। তা সত্ত্বেও এরা একই রূপিম। কারণ এদের অর্থ এক এবং এরা পরস্পরের সঙ্গে পরিপূরক অবস্থানে রয়েছে, অর্থাৎ একের জায়গায় অন্যটি বসতে পারে না। Cat-এর সঙ্গে -en যোগ হতে পারে না, তেমনি Ox-এর সঙ্গে -s বা -es যোগ হতে পারে না। এদের অবস্থান সর্তাধীন। এরা একই রূপিমের অবস্থানগত বৈচিত্র্য। বিশেষজ্ঞরা এই রকমের বৈচিত্র্যকেই উপরূপ (allomorph) বলেছেন :

"An **allomorph** is a variant of a morpheme which occurs in certain definable environments. A **morpheme** is a group of one or more allomorphs..."[৫৭] এবং

"Two elements can be considered as allomorphs of the same morpheme if : (1) they have a common meaning, (2) they are in complementary distribution, AND (3) they occur in parallel formations. Note that there are three requirements. All three must be met."[৫৮]

দু'টি উপরূপের (allomorph) মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য থাকে কিন্তু ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে না। এক-একটি রূপিমের কখনো কখনো একাধিক উপরূপ থাকে,

---

৫৭। Gleason, H. A. (Jr.) : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, 1968, p. 61.

৫৮। Ibid. : p. 88.

সব উপরূপগুলিকে নিয়েই একটি রূপিম গঠিত হয়। কখনো বা কোনো রূপিমের একটিই রূপ থাকে, কোনো উপরূপ থাকে না। একই রূপিমের উপরূপগুলিকে '~' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—ইংরেজিতে বহুবচন-প্রত্যয় /s~es~z~en/, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় আ ~ ইকা ~ আনী ইত্যাদি। সব উপরূপ একটি রূপিমের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এইভাবে {-z_1}। যখন রূপতাত্ত্বিক কারণে (অর্থাৎ শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদিতে) একটি রূপিম বিভিন্ন পরিবেশে (distribution) অল্পস্বল্প ধ্বনি-পরিবর্তন লাভ করে তখন সেই ধ্বনি-পরিবর্তনকে রূপগত বা রূপতত্ত্ব-প্রভাবিত ধ্বনি-পরিবর্তন (Morphophonemic change) বলে। যেমন—ইংরেজি বহুবচন-প্রত্যয় /s/ তিন রকম পরিবর্তন লাভ করে।

(১) অঘোষ ধ্বনির পরে /s/ ; যেমন—cats/kæts/

(২) সঘোষ ধ্বনির পরে /z/ ; যেমন—bees/bi:z/

(৩) /s z ʃ ʒ c ɟ/-এর পরে /iz/ ; যেমন—fishes/fiʃiz/

বাংলা 'কর্' ধাতু স্বরসঙ্গতির ফলে কখনো 'কোর্' হয়, কখনও 'কর'-ই থাকে। যেমন—

আমি করি = [কোরি]
তুমি করো
তুই কর্
সে করে।

এখানে 'কর্' থেকে যে 'কোর্' হয়েছে, এটা হল 'কর্' ধাতুর রূপতত্ত্ব প্রভাবিত ধ্বনি-পরিবর্তন (Morphophonemic change)।

অন্যদিকে যদি এমন হয় যে, দু'টি ধ্বনিগুচ্ছের অর্থাৎ শব্দ বা শব্দাংশের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই, তবে সেই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে একই রূপিম বলা হয় না, এরকমের শব্দ বা শব্দাংশকে 'সমধ্বনি রূপ' (Homophonous Forms) বলে। যেমন—বাংলায় 'সে বই পড়ে' এবং 'গাছ থেকে পাতা পড়ে'—এই দুই বাক্যের 'পড়্' ধাতুর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই। সুতরাং দুই বাক্যের 'পড়্' ধাতু একই রূপিম নয়। তেমনি ইংরেজিতে cats শব্দের '-s' এবং runs শব্দের '-s' ধ্বনিগত দিক থেকে একই রকম, কিন্তু এদের অর্থ পৃথক্। cats শব্দে '-s' বহুবচনের অর্থ বহন করে। 'runs' শব্দের '-s' প্রথম পুরুষের একবচনের ক্রিয়া-বিভক্তি। সুতরাং দু'টির অর্থ পৃথক্। এই দুই '-s' তাই একই রূপিম নয়, পৃথক্ রূপিম। এরা হল সমধ্বনি রূপ (Homophonous Forms)।

এই হল রূপিম সনাক্ত করার প্রধান কয়েকটি সূত্র ও পদ্ধতি। এইসব সূত্রের

শুধু মোটামুটি ব্যাখ্যাই এখানে দেওয়া হল। এদের আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও উপসূত্র আছে। এছাড়া আরো কিছু সূত্র ও পদ্ধতিগত ধাপ আছে। কিন্তু সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। উপরে যে ক'টি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করা হল তাতে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে রূপিম-বিশ্লেষণের মূল পদ্ধতি বোঝা যাবে। অপরিচিত ভাষার শব্দের গঠন বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি বিশেষ কাজে লাগে। মাতৃভাষা ও যেসব ভাষা আমাদের বিশেষ পরিচিত তাদের গঠন আমরা অল্পবিস্তর জানি। সেইজন্যে পরিচিত ভাষার শব্দগঠন বিশ্লেষণে এর উপযোগিতা ঠিক বোঝা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত ভাষা ও উপভাষা এবং উপজাতিদের অজ্ঞাত ভাষা বিশ্লেষণে রূপিম সনাক্তকরণের পদ্ধতিটি বিশেষ সহায়ক।

রূপিম নির্ণয়ের এইসব বিধিবিধান জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'টি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, আমরা যে ভাষার উপাদান থেকে রূপিম (Morpheme) নির্ণয় করি, নির্ণীত রূপিমগুলি সেই বিশেষ ভাষারই সম্পদ। এক ভাষার রূপিম সব ভাষার রূপিম নয়, অর্থাৎ সার্বভাষিক রূপিম বলে কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত, রূপিম হল ভাষার সামগ্রিক গঠনের একটি অঙ্গ। ভাষাদেহে প্রত্যেক অঙ্গের বিন্যাসের নিজস্ব স্থান ও রীতি আছে। কোনো কোনো ভাষার গঠনে প্রত্যেক রূপিমের ব্যবহারের স্থান নির্দিষ্ট। ভাষার গঠনে একটি রূপিম বা তার উপরূপ যে-যে স্থানে বসে সেই-সেই স্থানকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে সেই রূপিমের অবস্থান (Distribution) বলে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন্ রূপিমের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন—

"The *distribution* of the morpheme is the sum of all the contexts in which it can occur in contrast to all those in which it cannot occur."[৫৯]

যেমন—'কলমগুলি টেবিলে রয়েছে' এবং 'দেবতারা স্বর্গে থাকেন' এই দুই বাক্যে '-গুলি' এবং '-রা' হল বহুবচন-প্রত্যয়। দু'য়ের অর্থ একই, কিন্তু বিশেষ সাহিত্যিক প্রয়োগ ছাড়া 'দেবতা-র সঙ্গে '-গুলি' এবং 'কলম'-এর সঙ্গে '-রা' ব্যবহৃত হতে পারে না। এই যে '-গুলি' ও '-রা'-এর সুনির্দিষ্ট স্থান এই স্থানকে বলে অবস্থান (Distribution)।

৫৯। Ibid., p. 56.

॥ ২০ ॥

মূলরূপ বা রূপিমের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Morphemes)

রূপিম বা মূলরূপ দু'রকমের হতে পারে—মুক্ত বা স্বচ্ছন্দ রূপিম (Free Morpheme) এবং বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)। যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি ভাষায় অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত না হয়েও স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) বলে। যেমন—'আম আমাদের প্রিয় ফল'। এখানে 'আম' হল মুক্ত রূপিম। কিন্তু যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি সর্বদা অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে। যেমন—'সুপক্ক আমের রস আমার প্রিয় খাবার।' এখানে 'আমের' শব্দের '-এর' বিভক্তিটি বদ্ধ রূপিম। 'এই ছেলেটি ভারি মিষ্টি' এবং 'ঐ ছেলেটা বকাটে'—এই দু'টি বাক্যে '-টি' ও '-টা' হল বদ্ধ রূপিম। '-টি' ও '-টা' দু'টিরই অর্থ আছে, আছে বলেই 'ছেলেটি' বললে একটা আদরের ভাব এবং 'ছেলেটা' বললে একটা ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠে। '-টি' ও '-টা' দু'য়েরই সূক্ষ্ম অর্থ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও '-টি' বা '-টা'র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হবার স্বাধীনতা নেই। সব সময় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এগুলি ব্যবহৃত হয়। এই রকমের রূপিমকেই বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে। 'ছেলেটি' শব্দে 'ছেলে' হল মুক্ত রূপিম আর '-টি' হল বদ্ধ রূপিম। তেমনি 'ছেলেটা' শব্দে 'ছেলে' হল মুক্ত রূপিম আর '-টা' হল বদ্ধ রূপিম। ইংরেজিতে 'Kindly' শব্দে 'Kind' হল মুক্ত রূপিম এবং 'ly' হল বদ্ধ রূপিম।

আবার আর এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ এমন আছে যেগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন—'না', 'হ্যাঁ' ইত্যাদি। এছাড়া অধিকাংশ শব্দই এমন যে, সেগুলিকে আরো ছোট অংশে ভাগ করা যায়। এই ধরনের এক-একটি শব্দকে ভাগ করে আমরা তাতে দু'রকমের রূপিম পাই : ধাতু (root) এবং প্রত্যয় (affix)। যেমন 'গমন' শব্দ = গম্ (ধাতু) + অন (অনট্) (প্রত্যয়)। ধাতু কথাটি সাধারণত ক্রিয়ার মূল অর্থে প্রচলিত। কিন্তু এখানে আমরা শুধু ক্রিয়ার মূল নয়, নাম-পদেরও মূল অংশ বোঝাতে ধাতু কথাটি একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, পাণিনি যখন বলেছিলেন শুধু ক্রিয়া-শব্দ নয়, নাম-শব্দের মূলেও একটি করে ধাতু রয়েছে,

তখন তিনিও ধাতু কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। যেমন—'রাম' শব্দ = রম্ (ধাতু) + ঘঞ (প্রত্যয়) ; 'রাম' হল নাম-শব্দ, ক্রিয়া নয়।

সাধারণত ক্রিয়ামূল বা শব্দের পরে যা যোগ হয় তাকে আমরা প্রত্যয় বলি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে শব্দ বা ধাতুর আদিতে, মধ্যে বা অন্তে যা যোগ হয়, তা-ই হল প্রত্যয় (affix)। এই প্রত্যয় (affix) তিন শ্রেণীর : উপসর্গ (ব্যাপক অর্থে Prefix), পরসর্গ (Suffix) ও মধ্যসর্গ (Infix)। শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ (Prefix), অন্তে যা যোগ হয় তাকে বলে পরসর্গ (Suffix) এবং শব্দের মধ্যে যা যোগ হয় তা হল মধ্যসর্গ (Infix)। যেমন 'অনুচর' শব্দে 'অনু-' হল উপসর্গ। 'চরণ' (√ চর্ + অন ~ অনট্) শব্দে '-অন (অনট্)' হল পরসর্গ। ইংরেজিতে abnormal (ab+normal) শব্দে 'ab' হল উপসর্গ, 'normally' শব্দে '-ly' হল পরসর্গ। 'intake' শব্দে 'in-' হল উপসর্গ, 'taking' শব্দে 'ing' হল পরসর্গ। মধ্যসর্গ (infix) যোগের উদাহরণ বিরল হলেও পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় মধ্যসর্গ যোগের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন ম্যাক্স্ম্যূলর্ : তগল (Tagala) ভাষায় 'Sulat' শব্দের অর্থ 'লিপি'। এতে '-un-' মধ্যসর্গ যোগ করে হবে S-un-ulat = 'লেখা', 'u-ng-m'-মধ্যসর্গ যোগ করে হবে (S-u-ng-m-ulat) = 'লিখেছিল'।

শুধু ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়, আবার অনেক সময় ধাতুর সঙ্গে আগে একটা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ-গঠিত রূপিম যোগ করে তারপরে তার সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করা হয়। এই রকম অতিরিক্ত রূপিমহীন ধাতু বা অতিরিক্ত রূপিমযুক্ত ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে যা গঠন করা হয় তাকে প্রাতিপদিক (Stem) ও ক্রিয়ামূল বলে।

প্রত্যয় যোগের আগে ধাতুর সঙ্গে অনেক সময় যে ধ্বনি বা রূপিমটি যোগ করে নেওয়া হয় তাকে বিকরণ (stem formative) বলে। যেমন (১) ভাঙ্ (ধাতু) + ছি (প্রত্যয়) = ভাঙছি। (২) ভাঙ্ (ধাতু) + আ (বিকরণ stem formative) + ছি (প্রত্যয়) = ভাঙাচ্ছি। প্রথম উদাহরণের 'ভাঙ্' ও দ্বিতীয় উদাহরণের 'ভাঙা' দু'টিই হল stem। কোনো কোনো শব্দ একটিমাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত হয়। একে সিদ্ধ বা মৌলিক শব্দ (Simple or Root Word) বলে। যেমন—মা, ভাই, আম। আবার কোনো কোনো শব্দ একাধিক রূপিমের সংযোগে গঠিত হয়। ওরকম একাধিক রূপিমের সংযোগে গঠিত শব্দাবলী আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই শ্রেণীর নাম হল—জটিল শব্দ (Complex Word) এবং সমাসবদ্ধ শব্দ (Compound Word)। একটি মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিম যুক্ত করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে জটিল শব্দ (Complex Word) বলে। যেমন—রাত (মুক্ত রূপিম) +

এর (ষষ্ঠী বিভক্তি, বদ্ধ রূপিম) = রাতের (জটিল শব্দ)। একটি মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক মুক্ত রূপিম যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন—রাত (মুক্ত রূপিম) + দিন (মুক্ত রূপিম) = রাতদিন (সমাসবদ্ধ শব্দ)। জটিল শব্দ বা সমাসবদ্ধ শব্দের যে গঠন তাকে রূপগত গঠন (Morphological Construction) বলে। এই রূপগত গঠন রূপতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে জটিল শব্দের গঠন অর্থাৎ মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিমের সংযোগ-সম্মিলন এবং তার দ্বারা ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদির বৈচিত্র্য সংঘটনই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই কথা মনে রেখে এর পর বাংলা রূপতত্ত্বের মূলসূত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

॥ ২১ ॥

বাংলা রূপতত্ত্বের মূলসূত্র
(Fundamental Principles of Bengali Morphology)

রূপিম বা মূলরূপের (Morpheme) ধারণাটি আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অবদান। এই ধারণাটি গড়ে উঠার আগে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণেও—বিশেষত পাণিনি-প্রবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায়—রূপতত্ত্বের আলোচনা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। রূপতত্ত্ব হল প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি সমৃদ্ধ অংশ। আগেই বলেছি শব্দের গঠন ও রূপবৈচিত্র্যই এই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য ছিল।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে প্রথম আলোচ্য হল বাংলা শব্দ কিভাবে গঠিত হয়, তারপরে আলোচ্য হল এই গঠিত শব্দ ভাষায় যখন ব্যবহৃত হয় তখন কিভাবে তার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়।

বাংলা শব্দের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ (Structure of Bengali Words and their Structural Classification) : আমরা আগে রূপিমের (Morpheme) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছি যে, রূপিম হল এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক (Minimal meaningful unit)। এই রূপিমই হল শব্দ-গঠনের উপাদান। বাংলা শব্দ তিনভাগে গঠিত হয়--

(১) কখনো একটিমাত্র রূপিমের সাহায্যে। যেমন—মা, ভাই, ও।

(২) কখনো একাধিক রূপিমের সমবায়ে। একাধিক রূপিমের সাহায্যে

শব্দের গঠন আবার দু'ভাবে হয় :

(ক) কখনো এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে—যেমন—গম্ + অন (অনট্) = গমন।

(খ) কখনো এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে। যেমন—মাষ্টার + ঈ = মাষ্টারী।

(৩) কখনো একটি শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দের সংযোগে। যেমন-- ভাই + বোন = ভাইবোন।

বাংলা শব্দের গঠনের এই মূলসূত্রের আলোকে বাংলা শব্দের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হয় :

যে শব্দ একটি মাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত সেই শব্দকে সরল বা মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ (Simple or Root word) বলে। যে শব্দ এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে অথবা শুধুই একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে গঠিত হয় তাকে জটিল শব্দ (Complex word) বলে। এটাই হল প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ। যেমন—'গড়ন' = গড়্ + অন। এখানে 'গড়্' ধাতু (বদ্ধ রূপিম), অন প্রত্যয় (বদ্ধ রূপিম)। আর যে শব্দ একাধিক মুক্ত রূপিম বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বা সমস্ত পদ (Compound word) বলে। যেমন—ভাইবোন = ভাই + বোন (দু'টিই মুক্ত রূপিম)। গড়ন-পেটন = গড়ন + পেটন (দু'টিই শব্দ)।

ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে শব্দের যে গঠনগত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তা অনেকটা আধুনিক শ্রেণী বিভাগেরই মতো। ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই দু'টি শ্রেণী হল—মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ (Simple or Root Word) এবং সাধিত শব্দ (Derived or Composed Word)। যে শব্দকে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলেও তার ভগ্ন অংশগুলির এমন কোনো অর্থ হয় না যে অর্থের সঙ্গে মূল শব্দের অর্থের কোনো সঙ্গতি আছে, তাকে মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ (Simple or Root Word) বলা হয়। যেমন—মা, কাকা, গাছ ইত্যাদি। এদের মধ্যে যে-কোনো একটি শব্দকে আমরা আরো ছোট-ছোট অংশে ভাগ করে দেখতে পারি তার অংশগুলির কোনো অর্থ হয় কিনা। যেমন—'মা' শব্দটিকে আমরা 'ম্ + আ'—এইভাবে দুই অংশে ভাগ করতে পারি, কিন্তু 'ম্' বা 'আ' কোনো অংশেরই কোনো অর্থ হয় না। 'গাছ' শব্দটিকে অবশ্য 'গা + ছ' দুই অংশে ভাগ করা যায়, কিন্তু এই অংশগুলির মধ্যে 'ছ'-এর কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু 'গা' অংশের একটা স্বতন্ত্র অর্থ বাংলায় হয়—'শরীর', 'দেহ'। কিন্তু এই অর্থের সঙ্গে 'গাছ' শব্দের অর্থের কোনো যোগ থাকে না। সুতরাং 'মা', 'গাছ' ইত্যাদি হল মৌলিক শব্দ।

অন্যদিকে যে শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় এবং মূল শব্দের অর্থের সঙ্গে অংশগুলির অর্থের সঙ্গতি বা যোগ থাকে তাকে সাধিত শব্দ বলে। যে সাধিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার অংশগুলির মধ্যে একাধিক অর্থযুক্ত প্রধান অংশ পাওয়া যায় এবং অন্য অংশগুলিকে তার সঙ্গে যুক্ত প্রধান অংশের অর্থের পরিবর্ধন বা পরিবর্তনকারী অংশ বলে উপলব্ধি করা যায় সেই শব্দকে প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বলে। যেমন—আমূল, নির্মূল ইত্যাদি। এই শব্দ দু'টি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—আ + মূল এবং নির্ + মূল। এই দু'টি শব্দে প্রধান অংশ হল 'মূল'। আমরা বুঝতে পারছি প্রধান অংশেই শব্দের আসল অর্থের উৎস নিহিত আছে। এই শব্দ দু'টিতে প্রধান অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে 'আ-' এবং নির্-'। এই দু'টি হচ্ছে অপ্রধান অংশ। অথচ এই অপ্রধান অংশগুলি প্রধান অংশের অর্থের এমন পরিবর্তন সাধন করেছে যে, শব্দ দু'টির সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে।

যে সাধিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বা সমস্ত শব্দ (Compound word) বলে। যেমন—ভাই-বোন (ভাই + বোন = একাধিক মৌলিক শব্দ)। শ্রবণ-মনন (শ্রবণ + মনন = একাধিক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ)।

রূপবৈচিত্র্য ও ব্যাকরণিক সংবর্গ (Morphological Variations and Grammatical Categories) : উপরে সংক্ষেপে বাংলা শব্দের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হল। কিন্তু শুধু শব্দের গঠনই রূপতত্ত্বের আলোচনার শেষ কথা নয়। বাক্য-মধ্যে শব্দ কি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার সেই ভূমিকা কিভাবে চিহ্নিত হয়, তা-ই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করলে শব্দের এই ভূমিকা শুরু হয়। বাক্যে ব্যবহৃত হলে শব্দকে পদ (Part of Speech) বলে। বাংলা বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন পদের ভূমিকা এবং পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে পদকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—নামপদ বা বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং অব্যয় (ও অব্যয় জাতীয় পদ)। বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণকেও (adverbs) বাংলায় বিশেষণের মধ্যেই ধরা হয়। বাক্যের পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্যে অথবা বাক্যের মধ্যে পদগুলির ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্যে শব্দের অঙ্গ হিসাবে যেসব রূপিম যোগ করা হয় সেগুলিকে বিভক্তি বলে। এই রূপিমগুলি যুক্ত হয়ে থাকার ফলে শব্দের রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়।

অব্যয়ের কোনো রূপবৈচিত্র্য নেই, অব্যয়ের সঙ্গে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না ; শুধু বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ্য

(বা নামপদ) ও সর্বনামের বিভক্তি একই বিভাগে আলোচ্য। সে বিভাগটি হল কারক-বিভক্তি। বিশেষণ যখন বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন তার সঙ্গে সাধারণত কোনো কারক-বিভক্তিই যোগ হয় না। সুতরাং বিভক্তি যোগে রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয় প্রধানত নাম বা বিশেষ্যের ও ক্রিয়ার। তাই বিভক্তি হল দু' প্রকার। যথা—নাম-বিভক্তি (সুপ্) ও ক্রিয়া-বিভক্তি (তিঙ্)। এই বিভক্তি যোগে যে রূপবৈচিত্র্যই সাধিত হয় তা-ই হল রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্যই বাংলা রূপতত্ত্বে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একে যথাক্রমে শব্দরূপ (Declension) ও ক্রিয়ারূপ (Conjugation) বলে। বচন (Number), লিঙ্গ (Gender), পুরুষ (Person), কারক (Case), কাল (Tense), ভাব-প্রকার (Mood) প্রভৃতি রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলিকে ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি (Grammatical Category) বলে। এইসব ব্যাকরণিক সংবর্গ সব ভাষার রূপতত্ত্বকে সমান নিয়ন্ত্রিত করে না, এক-এক ভাষায় এদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এক-এক রকম, এবং তার উপরেই ভাষাবিশেষের রূপতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যও নির্ভর করে।

শব্দরূপ (Declension) :

লিঙ্গ (Gender) : বাংলার লিঙ্গ-বিধির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়ে। আমরা জানি বাংলায় লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু ইংরেজিতে এই তিনটি ছাড়া আছে—উভয়লিঙ্গ (Common Gender)। আজকাল ইংরেজির অনুসরণে বাংলাতেও কেউ কেউ উভয়লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের মতে সন্তান, কবি, শিশু ইত্যাদি হল উভয়লিঙ্গ। সংস্কৃত ও জার্মানেও লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। আবার হিন্দি ও ফরাসিতে লিঙ্গ শুধু দু'প্রকার—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। ফলে যেসব শব্দকে আমরা ক্লীবলিঙ্গ মনে করি সেগুলি এইসব ভাষায় হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় লিঙ্গ অর্থনির্ভর, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ, আর অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন—বাংলায় ঘোড়া = পুংলিঙ্গ, মেয়ে = স্ত্রীলিঙ্গ, লত্র = ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ-নির্ণয়-বিধিতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্য আছে। এইসব ভাষায় লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনির্ভর হলেও সর্বদা অর্থনির্ভর নয়, কতকটা শব্দের গঠননির্ভর এবং কতকটা প্রথানির্ভর ; ফলে অনেক সময় অর্থের সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ থাকে না। যেমন—সংস্কৃতে সূর্য = পুংলিঙ্গ, নদী =

স্ত্রীলিঙ্গ, লতা = স্ত্রীলিঙ্গ, উদ্যান = ক্লীবলিঙ্গ, কলত্র (ভার্যা) = ক্লীবলিঙ্গ ; জার্মানে Garten (উদ্যান) = পুংলিঙ্গ, Fluss (নদী) = পুংলিঙ্গ, Sonne (সূর্য) = স্ত্রীলিঙ্গ, Mädchen (মেয়ে) = ক্লীবলিঙ্গ, Pferd (ঘোড়া) = ক্লীবলিঙ্গ ; ফরাসিতে livre (বই) = পুংলিঙ্গ, soleil (সূর্য) = পুংলিঙ্গ, fleuve (সমুদ্রগামী নদী) = পুংলিঙ্গ, jardin (উদ্যান) = পুংলিঙ্গ ; হিন্দিতে কপড়া (কাপড়) = পুংলিঙ্গ, কিতাব (বই) ও গুড়িয়া (পুতুল) = স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদি। এইসব ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় বাংলায় লিঙ্গবিধি অর্থনির্ভর বলে লিঙ্গ-নির্ণয় অনেক সহজ। ফরাসি ভাষায় লিঙ্গ পুরোপুরি অর্থনির্ভর নয়, অনেকটা গঠননির্ভর। গঠননির্ভর বলেই সে ভাষায় লিঙ্গবিধিতে খেয়ালখুশির বিশেষ স্থান নেই। বরং গঠনগত বিধিনির্ভরতায় মোটামুটি সঙ্গতি আছে। সেখানে সাধারণত '-e' অন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, বাকি প্রায় সব শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—ami (ছেলেবন্ধু) = পুংলিঙ্গ, amie (বান্ধবী) = স্ত্রীলিঙ্গ, voisin (পুরুষ প্রতিবেশি) = পুংলিঙ্গ, voisine (প্রতিবেশিনী) = স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব খুব বেশি নেই। বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যয় যোগ হয় এবং তার ফলে তাদের পৃথক্ পৃথক্ রূপ দাঁড়িয়ে যায় ; যেমন : বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, পাঠক—পাঠিকা, সাধক—সাধিকা, কাকা—কাকি, বেটা—বেটি, বেদে—বেদেনী। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ হয় না। যেমন—আমি, তুমি, সে প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রূপে থাকে। বাংলায় বিশেষণের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে আমরা কখনো কখনো বিশেষণের রূপ পৃথক্ হতে দেখি বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের একই রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ছোট ছেলে—ছোট মেয়ে ; বড় ভাই—বড় বোন। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষণের লিঙ্গভেদ বিশেষ্য অনুযায়ী হয়। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয় সে কথা আমাদের সকলের জানা। যেমন : পুংলিঙ্গ—সুন্দরঃ নরঃ, স্ত্রীলিঙ্গ—সুন্দরী নারী, ক্লীবলিঙ্গ—সুন্দরম্ ফলম্। লিঙ্গভেদ অনুসারে বিশেষণের রূপভেদ জার্মান ও ফরাসি ভাষাতেও লক্ষণীয়। যেমন—জার্মানে : পুংলিঙ্গ—der *guter* Mann (ভালো লোকটি), স্ত্রীলিঙ্গ—de *gute* Frau (ভালো ভদ্রমহিলাটি)। ফরাসি ভাষায় : পুংলিঙ্গ—*bon* homme (ভালো লোক), স্ত্রীলিঙ্গ—*bonne* femme (ভালো মহিলা)। বাংলায় তৎসম বিশেষণের রূপ লিঙ্গভেদে পৃথক্ হয় (যেমন—সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী নারী), কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ হয় না। (যেমন : পুংলিঙ্গে—ভালো কাকা, স্ত্রীলিঙ্গে—ভালো কাকিমা)। ইংরেজিতে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ একেবারেই হয় না (যেমন : পুংলিঙ্গ-

-the *good* boy, স্ত্রীলিঙ্গ—the *good* girl। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্যটি লক্ষণীয়। বাংলা এক্ষেত্রে ক্রমশ ইংরেজি ভাষার মতো বিশ্লেষণাত্মক গঠনবৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিশেষণের রূপনিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব ক্ষীয়মাণ, আর ক্রিয়ার রূপনিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই, কিন্তু হিন্দিতে আছে। ক্রিয়ারূপের প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করা হবে। হিন্দিতে কখনো কখনো আবার সম্বন্ধ পদের বিভক্তি পরিবর্তিত হয় সম্বন্ধিত পদের লিঙ্গ অনুসারে। যেমন : হিন্দিতে—রামের রুটি = রাম কী রোটী (স্ত্রী) ; রামের ভাত = রাম কা ভাত (পুং)। ফরাসিতে আবার অধিকারী সর্বনামের (possessive pronoun) লিঙ্গ তার অর্থ অনুসারে হয় না, অধিকৃত শব্দের লিঙ্গ অনুসারে হয়। ফরাসিতে কলম = prote-plume (স্ত্রী)। কলমের মালিক পুংলিঙ্গ হলেও 'তার কলম' = sa porte-plume (এখানে sa = সে = স্ত্রীলিঙ্গ)। কিন্তু livre = বই = পুংলিঙ্গ। বইয়ের মালিক স্ত্রীলিঙ্গ হলেও 'তার বই' = son livre (এখানে son = সে = পুংলিঙ্গ)।

বচন (Number) : বাংলা রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব বিশেষ নেই ; কিন্তু বচনের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। সংস্কৃত বা গ্রীকের মতো বাংলায় দ্বিবচন নেই ; হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার মতো বাংলায় বচন মাত্র দু'টি—একবচন (Singular) ও বহুবচন (Plural)। বাংলায় একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক্ রূপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত। যেমন : একবচন—ছেলে, বহুবচন—ছেলেরা, একবচন—বই, বহুবচন—বইগুলি। তবে বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুত্ববোধক কোনো বিশেষণ থাকে সেখানে বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক্ রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাষায় এক্ষেত্রেও বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয় যোগ করে তার পৃথক্ রূপ দেওয়া হয়। সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপ পৃথক্। এসব ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্যটি চোখে পড়ে। যেমন—

	একবচন	বহুবচন
হিন্দিতে	এক কিতাব	বহুৎ কিতাবেঁ
সংস্কৃতে	একম্ পুস্তকম্	বহুনি পুস্তকানি
ইংরেজিতে	One book	Many books
জার্মানে	Ein Buch	Viele Bücher
ফরাসিতে	un livre	beaucoup de livres
কিন্তু বাংলায়	একটি বই	অনেক বই

এখানে একবচন ও বহুবচনে 'বই' শব্দের একই রূপ।

সর্বনামের রূপে বাংলায় ফরাসি ভাষার মতো বচনের অব্যর্থ প্রভাব রয়েছে। একবচন ও বহুবচনে সর্বনামের রূপ পৃথক্ হয়ে থাকে। যেমন : আমি—আমরা, তুমি--তোমরা ইত্যাদি। ফরাসি je (আমি)—nous (আমরা)। এ বিষয়ে অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলার বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষাতে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বচনভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না। ইংরেজিতে you (তুমি, তোমরা) এবং জার্মানে Sie (তুমি, তোমরা) একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে একই রূপ। হিন্দিতে 'আপ' (= 'আপনি', কখনো-কখনো 'তিনি') একবচন অর্থে ব্যবহৃত হলেও বহুবচনের ক্রিয়া গ্রহণ করে। যেমন--আপ যাতে হ্যাঁয়্।

বাংলায় সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের প্রভাব থাকলেও আবার বিশেষণের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব নেই। একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই রকম হয়ে থাকে। যেমন—ভাল ছেলে, ভাল ছেলেরা। শুধু বিশেষণের দ্বিত্ব সাধন করে কখনো কখনো তার দ্বারা বহুবচনের কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় না। যেমন : একবচন—পাকা কথা, বহুবচন--পাকা-পাকা কথা। বিশেষণের রূপনিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজির সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি থেকে বাংলার পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলার মতো ইংরেজিতেও একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই থাকে। যেমন : একবচন—good boy, বহুবচন—good boys। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় বচনভেদে বিশেষণেরও রূপভেদ হয়। যেমন : সংস্কৃত—সুশীল নরঃ, সুশীলাঃ নরাঃ ; জার্মান—guter Mann, gute Männer ; ফরাসি—bon homme, bons hommes।

কারক (Case) : বাংলায় 'কারক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় এখন 'কারক' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণের 'কারক' এবং ইংরেজি ব্যাকরণের 'Case'-এর তাৎপর্য ঠিক এক নয়। পাণিনির মতে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' --ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তা-ই হল কারক। এই সম্পর্কের প্রকারভেদ অনুসারে সংস্কৃতে কারক হল—কর্তৃ কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। কিন্তু ইংরেজি মতে শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে নয়, বাক্যের অন্তর্গত যে-কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে অন্য যে-কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তাকেই Case বলে। এই সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে Case আট রকম—Nominative (কর্তৃকারক), Accusative (কর্মকারক), Instrumental (করণকারক), Dative (সম্প্রদান কারক), Ablative (অপাদান কারক),

Genitive or Possessive (সম্বন্ধ পদ), Locative (অধিকরণ কারক) এবং Vocative (সম্বোধন পদ)। সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য মতে Genitive ও Vocative-কে কারক বলা হয়, কিন্তু সংস্কৃত মতে এগুলি কারক নয়, এগুলিকে বলা যায় যথাক্রমে সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ। কারণ এদের সঙ্গে ক্রিয়ার সোজাসুজি কোনো সম্পর্ক থাকে না, অথচ সংস্কৃত মতে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কই হল কারকের মূল কথা। যেমন—রামের ভাই লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বনে সীতাকে রক্ষা করার জন্যে থেকে গেলেন। এখানে ক্রিয়া হল 'থেকে গেলেন'। এই বাক্যে 'থেকে যাওয়া'র কাজটি রাম করেন নি, লক্ষ্মণই করেছিলেন। সুতরাং এই বাক্যের 'রামের' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই, তাই সংস্কৃত মতে 'রামের' শব্দটি কারক নয়, সম্বন্ধ পদ। অন্যদিকে 'রামের ভাই' এই পদগুচ্ছে 'রামের' সঙ্গে 'ভাই' শব্দের সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক হল সম্বন্ধের সম্পর্ক। ইংরেজি সংজ্ঞা অনুসারে এটাও কারক। যাই হোক ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃতের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণত ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'কারক' শব্দই এখন প্রচলিত। এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বে কারক শব্দ Case শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

বাংলায় বিভিন্ন প্রকার কারকের রূপ প্রকাশিত হয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকার বদ্ধ রূপিম বা অতিরিক্ত স্বতন্ত্র শব্দের দ্বারা। এই বদ্ধ রূপিম ও স্বতন্ত্র শব্দকে যথাক্রমে বিভক্তি (Inflexion/case termination/case ending) ও অনুসর্গ (postposition) বলে। বিভক্তি ও অনুসর্গের কাজ একই, কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। বিভক্তি মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু অনুসর্গ মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে না, তার পাশে অবস্থান করে। যেমন--'রামকে' শব্দে '-কে' হল বিভক্তি এবং 'রামের দ্বারা' শব্দগুচ্ছে 'দ্বারা' হল অনুসর্গ।

বাংলা শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বাংলায় সাধারণত কারকের চিহ্নরূপে কিছু বিভক্তি ও কিছু অনুসর্গ যুক্ত হয়, কিন্তু ফরাসি ও ইংরেজিতে বিভক্তি নেই, অনুসর্গও নেই, কিছু পুরঃসর্গ (preposition) দিয়ে বিভক্তির কাজ চলে। যেমন—'প্রতিদিনের' = ফরাসি ভাষায় de tous les jours, ইংরেজিতে of everyday. এখানে ফরাসিতে de এবং ইংরেজিতে of হল preposition। এগুলি বাংলার ষষ্ঠী বিভক্তি '-এর' বদলে বসেছে। এরাই বিভক্তির কাজ করছে। এরা বাংলা বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না, আবার বাংলা অনুসর্গের মতো শব্দের পরেও বসে না, শব্দের আগে বসে।

মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তিচিহ্ন যোগ করে মূল শব্দটির যে রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকে আমরা শব্দরূপ (Declension) বলি। প্রচলিত ব্যাকরণে কারকের নিয়মাবলী ও শব্দরূপের জটিলতা খুব বেশি, বিশেষত

সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) ভাষায় এবং জার্মান প্রভৃতি আধুনিক ভাষায়। এই বিভক্তি এবং পুরোনো কারকবিধির ত্রুটি লক্ষ্য করে এর জটিলতা বাদ দিয়ে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে নতুন তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং বাংলাতেও একজন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী এই রকম একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[৬০] এই তত্ত্ব ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করলে ব্যাকরণের অনেক অহেতুক জটিলতা দূর হবে।

পূর্বেই আটটি কারকের (Case) কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গঠনগত রূপবৈচিত্র্য বিচার করলে আধুনিক বাংলায় আটটি কারক পাওয়া যায় না। বাংলায় কর্তৃকারক ও সম্বোধন পদের রূপ একই রকম, কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের একই বিভক্তি, তেমনি করণ ও অধিকরণের রূপের মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই থাকে না। সুতরাং রূপগত বিচারে বাংলায় কারক মাত্র চারটি। এই চারটি কারকের সাধারণত প্রচলিত বিভক্তি-চিহ্ন হল এইরকম—

কর্তৃকারক : —০ (শূন্য বিভক্তি)— **রাম** যায়।

কর্ম-সম্প্রদান কারক : —'কে'— **রামকে** টাকা ধার দাও।

দরিদ্রকে অর্থ দান করো।

করণ-অধিকরণ কারক : —'তে',—'এ'—এই **টাকাতে** সংসার চলে?

এক **চড়ে** গাল ঘুরিয়ে দেবো।

ঘরের ছেলে **ঘরে** ফিরে এসো।

সম্বন্ধপদ : —'র', 'এর'— **ছেলের** জামা, **মেয়ের** ফ্রক।

একের লাঠি **দশের** বোঝা।

বিভিন্ন কারকে বাংলায় সাধারণত এইসব বিভক্তি ব্যবহৃত হলেও বাংলায় কোনো কারকেরই কোনো সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। এর ফলে বাংলা রূপতত্ত্বে শব্দরূপের দু'টি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। প্রথমত, যে বিভক্তি সাধারণত একটি কারকে প্রচলিত অন্য কারকেও তার তির্যক্ প্রয়োগ কখনো কখনো দেখা যায়। যেমন—কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি :

লোকে আজকাল বিশ্বাস করতে চায় না যে, দেশের কোনো নেতা কোনো সমস্যার আমূল সমাধান চান।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

৬০। দাশগুপ্ত, ড. প্রবাল : 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান' (শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা', ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।)

কর্ম কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

"**আমারে** করো তোমার বীণা
লহ গো লহ তুলে।"

আমায় দু'টি পয়সা দিন, বাবুরা।

করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

চোখে কি দেখতেও পাও না?

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করছি।

সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

অন্ধজনে দেহ আলো,

মৃতজনে দেহ প্রাণ।

অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি :

কালো মেঘে বৃষ্টি হয়।

এখন পড়ায় ওকে বিরত করা যাবে না।

চোরের ভয়ে রাস্তায় বেরোতে পারি না।

আপাদান কারকে তৃতীয়া বিভক্তি (অনুসর্গ) :

আমার চোখ **দিয়ে** জল গড়িয়ে পড়ল।

অধিকরণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি (অনুসর্গ) :

রাস্তা **দিয়ে** যেতে যেতে আমি সাইন বোর্ডগুলো দেখছিলাম।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে বাংলায় একই বিভক্তি বা অনুসর্গ একাধিক কারকের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেসব আধুনিক ভাষায় বিভক্তি ও অনুসর্গের বদলে পুরঃসর্গ (preposition) ব্যবহৃত হয় সেসব ভাষায়ও পুরঃসর্গের ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয়, একই পুরঃসর্গ একাধিক কারকে ও একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—জার্মান ভাষায় একই 'von' পুরঃসর্গটি একাধিক কারকের অর্থে ব্যবহৃত :

'থেকে' অর্থে :

von Kalkutta = কলকাতা থেকে।

'দ্বারা' অর্থে :

von Rilke = রিল্‌কের দ্বারা (রচিত)।

সম্বন্ধ অর্থে :

von Ram = রামের

তেমনি ফরাসি ভাষায় একই 'de' পুরঃসর্গের একাধিক অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সম্বন্ধ অর্থে :

d' (de) homme = মানুষের।

অধিকরণ অর্থে :

de rue en rue = পথে পথে।

করণ অর্থে :

de l' obstination = জেদের দ্বারা, জেদের বশে।

অপাদান অর্থে :

de chez vous = তোমার বাড়ি থেকে।

de Calcutta à Kalyani = কলকাতা থেকে কল্যাণী।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় বিভক্তি লোপের প্রবণতা এবং তার ফলে সব কারকেই শূন্য বিভক্তি প্রায়ই দেখা যায়। যেমন—

কর্তৃকারকে : **রাম** যায়।

কর্মকারকে : আমি **বই** পড়ি। আমি **মানুষ** চিনি। **গোরু** মেরে কি লাভ?

সম্প্রদান কারকে : এই উৎসবে প্রথমেই আমি **ব্রাহ্মণ** ভোজন করাতে চাই।

করণ কারকে : কথায়-কথায় ছাত্রকে **বেত** মারা ভাল নয়।
এক চড় মারবো।

অধিকরণ কারক : **কলকাতা** যাচ্ছি। **গাড়ি** চড়ো।

সম্বন্ধ পদ : **মাইনে** বাবদ (মাইনের বাবদ) ৪৫০০ টাকা পেয়েছি।

বাংলা শব্দরূপের যে আলোচনা করা হল তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলায় সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার মতো সব কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি-চিহ্ন নেই, আবার অন্য দিকে বাংলায় ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার মতো পুরোপুরি বিভক্তিহীনতাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কিছু বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং কিছু বিভক্তির তির্যক প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলা পুরোপুরি সংশ্লেষণাত্মক বা পুরোপুরি বিশ্লেষণাত্মক ভাষা নয়। এদিক থেকে জার্মান ভাষার সঙ্গে বাংলার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জার্মান ভাষায় সংস্কৃত ও গ্রীকের মতো কারকের সংখ্যা এত বেশি নয়। বিভক্তি-চিহ্নের বিচারে বাংলায় কারক যেমন চারটি মাত্র, জার্মান ভাষাতেও কারক তেমনি চারটি মাত্র। বাংলার চারটি কারক হল—(১) কর্তা, (২) কর্ম-সম্প্রদান, (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ। বিভক্তিচিহ্নের বিচারে জার্মানেও কারক চারটি। তবে সে চারটি বাংলা থেকে একটু স্বতন্ত্র। জার্মানের কারক চারটি হল—(১) কর্তা (Nominative), (২) কর্ম (Accusative), (৩)

সম্প্রদান (Dative) এবং (৪) সম্বন্ধ (Genitive)। জার্মানের কারকের সঙ্গে বাংলা কারকগুলির পুরোপুরি মিল নেই। শুধু লক্ষণীয় এই যে, একদিকে সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কারক-বিভক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার, অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার বিভক্তিহীনতা ও পুরঃসর্গের ব্যবহারে শৈথিল্য-প্রবণতা—এই দুই চরম বিন্দুর মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে বাংলা ভাষা এবং এ ক্ষেত্রে জার্মান ভাষার সঙ্গে বাংলার আংশিক সাদৃশ্য আছে, যদিও জার্মান বাংলার চেয়ে আরো দৃঢ়বদ্ধ ভাষা।

ক্রিয়ারূপ (Conjugation) : ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু (Root) বলে। শব্দের মতো ধাতুকেও গঠনগত বিচারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (১) **সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু** (Primary Root), (২) **সাধিত ধাতু** (Secondary / Derivative Root) এবং (৩) **যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু** (Compounded Root)।

যে ধাতু মূলত ধাতুই এবং যা একটি মাত্র রূপিম (Morpheme) নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ যে ধাতুকে একাধিক ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ এককে বিভক্ত করা যায় না, তাকে মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু বলে। যেমন—কর্, খা ইত্যাদি। যে ধাতু একাধিক রূপিম (Morpheme) নিয়ে গঠিত এবং যার অন্তর্গত রূপিমগুলির মধ্যে একটি হল ধাতু বা নামশব্দ বা অনুকারশব্দ আর অন্যটি বা অন্যগুলি হল প্রত্যয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু (Causative verb root), নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু প্রভৃতি সাধিত ধাতুর মধ্যে পড়ে। যেমন—খেল্ + আ = খেলা (ণিজন্ত ধাতু) > খেলাচ্ছি, খেলাচ্ছো, খেলাচ্ছে ; হাত (নামশব্দ) + আ (প্রত্যয়) = হাতা (নামধাতু) > হাতাচ্ছি, হাতাচ্ছো, হাতাচ্ছে। ধুঁক্ (অনুকার শব্দ) + শূন্য প্রত্যয় > ধুঁকছি, ধুঁকছে ইত্যাদি। বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে কর্, হ প্রভৃতি ধাতু ব্যবহার করে যে ক্রিয়ামূল গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু (Compounded Root) বলে। যেমন—গান (বিশেষ্য) = কর্ ধাতু + গান কর্ (যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু) > গান করছি, গান করছো, গান করছে। এসব ক্ষেত্রে একাধিক শব্দের সংযোগে একটিমাত্র ধাতু গঠিত হয় বলে সাধারণত একে সংযোগমূলক ধাতু বলে। যে সংযোগমূলক ধাতুর মূলে দু'টি ধাতু থাকে, সেই সংযোগমূলক ধাতুর দ্বারা গঠিত ক্রিয়াকে যৌগিক বা যুক্ত ক্রিয়া (Compound Verb) বলে। এগুলিতে একাধিক ক্রিয়ার ধাতু থাকে, কিন্তু তাতে একটিমাত্র কাজই বোঝায়। যেমন—'গান করা'-তে 'গা' (to sing) ও 'কর্' (to do) দু'টি ধাতু আছে, কিন্তু একটিমাত্র কাজ বোঝাচ্ছে—গান গাওয়া (to sing)। সংযোগমূলক ধাতু

একাধিক স্বতন্ত্র শব্দে গঠিত হয় বলে তাকে ঠিক একটি ধাতু বলা যায় কিনা সন্দেহ। সংযোগমূলক ধাতুকে ছেড়ে দিলে বাংলার আসল ধাতুসম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু এবং সাধিত ধাতু। আধুনিক কালের জনৈক স্বনামধন্য ভাষাবিজ্ঞানীর অনুসরণে আমরা বাংলার এই দ্বিবিধ ধাতুর ধ্বনিসংগঠন এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি :

"সিদ্ধ ধাতুমাত্রেই একাক্ষর (monosyllabic), কিন্তু সাধিত ধাতুমাত্রেই বহ্বক্ষর (polysyllabic)। বহ্বক্ষর হলেও ণিজন্ত (Causative) ধাতু মূলত দ্ব্যক্ষর (bisyllabic), কারণ তার উপাদানদুটিকে বিশ্লিষ্ট করলে একদিকে পাই একাক্ষর সিদ্ধধাতু, অন্যদিকে পাই ঐ বিস্তার-বিভক্তি 'আ'—সেটিও একটিমাত্র সিলেব্‌ল্।"[৬১] যেমন মৌলিক ধাতু 'কর্' একটি অক্ষরে (Syllable) গঠিত ; সাধিত ধাতু 'হাতা' দুটি অক্ষরে (Syllable) গঠিত—হাত্ + আ।

ধাতু হল ক্রিয়ার মূল। এই মূলের সঙ্গে নানা বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রিত করে যেসব ব্যাকরণিক সংবর্গ (Grammatical Category) সেগুলির মধ্যে প্রধান হল ভাব (Mood), পুরুষ (Person), কাল (Tense)। এই প্রসঙ্গে ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে বাংলার স্বাতন্ত্র্য অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে।

ভাব (Mood) : ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood)। ক্রিয়ার বর্ণিত কাজটি কিভাবে বা কি প্রকারে ঘটে তা যে উপায়ে বোঝা যায় তাকেই ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood) বলে। এর দ্বারা কাজটি সম্বন্ধে বক্তার মনোভাবটি বোঝা যায় বলে একে সহজ কথায় 'ভাব'ও (Mood) বলে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলায় ভাব বা ভাবপ্রকার (Mood) হল তিনটি :

(১) **বিবৃতিমূলক** (বা **নির্দেশক**) **ভাব** (Indicative Mood),

(২) **অনুজ্ঞা** (বা **নিয়োজক ভাব**) (Imperative Mood) এবং

(৩) **অপেক্ষিত** (বা **সম্ভাবক** বা **অভিপ্রায়** বা **সংযোজক**) ভাব (Subjunctive Mood)।[৬২]

৬১। সরকার, ড. পবিত্র : 'বাংলা ক্রিয়াপদ : ধাতু শরীর' (অধ্যাপক ড. চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত 'রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' ১৯৮৪, পৃঃ ১১৪।)

৬২। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', ১৯৭১, পৃঃ ১৩৯।

ঘটনার সাধারণ বিবৃতি বোঝালে বা ঘটনা নির্দেশ করা (to indicate) বোঝালে বিবৃতিমূলক বা নির্দেশক ভাব হয়। আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝালে অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood) হয়। আর ক্রিয়ার কাজটি ঘটা যদি অন্য ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে বা অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে বা ক্রিয়ার দ্বারা যদি ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বোঝায় তবে অপেক্ষিত বা অভিপ্রায় ভাব (Subjunctive Mood) হয়।

দেখা যাক এইসব ভাবপ্রকার বাংলায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধন করে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কর্তা একই থাকা সত্ত্বেও ভাবপ্রকার পৃথক হওয়ার জন্যে ক্রিয়ার রূপে পার্থক্য ঘটে—

বিবৃতিমূলক : সে পড়ে।

অনুজ্ঞামূলক : সে পড়ুক।

অপেক্ষিত : যদি সে পড়ে, তবে আমি পড়ব।
সে পড়লে, আমি পড়ব।

বাংলায় বিবৃতিমূলক ও অপেক্ষিত ভাবপ্রকারে ক্রিয়ার রূপ একই থাকে। যেমন—বিবৃতিমূলক—সে পড়ে। অপেক্ষিত—যদি সে পড়ে তবে আমি পড়ব। দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপ একই—'পড়ে'। বাংলায় নির্দেশক ও অপেক্ষিত ভাবে ক্রিয়ার রূপগত পার্থক্য হয় না বলে বাংলায় গঠনগত দিক থেকে অপেক্ষিত ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের উপযোগিতা নেই। এইজন্যে অপেক্ষিত ভাবটি বাদ দিয়ে বাংলা ক্রিয়ার মাত্র দু'টি ভাব নির্ণয় করা যায় : নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। এখানে বৈদিক, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বৈদিকের সঙ্গে তুলনায় ভাবপ্রকার (Mood)-এর ক্ষেত্রে বাংলার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। বৈদিকে ভাব ছিল পাঁচটি। যথা—

(১) **নির্দেশক** (Indicative),

(২) **অনুজ্ঞা** (Imperative),

(৩) **নির্বন্ধ** (Injunctive),

(৪) **সম্ভাবক বা অভিপ্রায়** (Subjunctive) ও

(৫) **বিধিলিঙ্** (Obtative)

এখন বাংলায় রূপগত বিচারে ভাবপ্রকার কমে দাঁড়িয়েছে দু'টি। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি আধুনিক ভাষাতে ক্রিয়ার ভাবপ্রকার হল তিনটি : নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও অপেক্ষিত। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় অধিকাংশ সময় বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ অপেক্ষিত ভাবের ক্রিয়ারূপ থেকে পৃথক্। জার্মান ভাষায় এই দুই ভাবপ্রকারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ একই হয় (যেমন—বিবৃতিমূলক—Ich lobe = আমি প্রশংসা করি ; অপেক্ষিত—Wenn Ich lobe

যদি আমি প্রশংসা করি) ; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক্ (যেমন—বিবৃতিমূলক—Er lobt = সে প্রশংসা করে, অপেক্ষিত—Wenn er lobe = যদি সে প্রশংসা করে)। দু'টি বিখ্যাত উক্তি থেকে অপেক্ষিত ভাবের উদাহরণ জার্মান ভাষায় দেওয়া যাক :

"Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser freilich,
Das Beste Wäre nie geboren sein!"

--Heinrich Heine

—ঘুমিয়ে থাকা ভাল, মৃত্যু নিশ্চয়ই আরো ভাল,
আর সবচেয়ে ভাল হত যদি আদৌ জন্মানো না যেত!

"Wenn alle Berge Bücher wären und alle Seen Tinte,
und alle Bäume Schreibfedern, noch wäre es nicht
genug, all den Schmerz in der Welt zu beschreiben"

—Baruch Spinoza

—যদি সব পর্বতগুলো বই হত, এবং যদি সব সমুদ্র হত কালি, আর সব গাছগুলো যদি কলম হত, তবু পৃথিবীর সব দুঃখ বর্ণনা করার পক্ষে তা যথেষ্ট হত না।

এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, যদিও জার্মান ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপেক্ষিত ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ার রূপ একই, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জার্মান ভাষায় এই দুই ভাবের ক্রিয়ারূপ পৃথক্। ফরাসি ভাষায়ও অপেক্ষিত (বা অভিপ্রায়) ভাবের ক্রিয়ারূপ ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ প্রায়ই পৃথক্।

জার্মান ও ফরাসি ভাষায় অপেক্ষিত বা অভিপ্রায় ভাবের ক্রিয়ারূপের স্বাতন্ত্র্য যেমন রক্ষিত আছে, ইংরেজিতে তেমনটি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষিত ও বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়ারূপ একই, মাত্র দু'ই-একটি ক্ষেত্রে দুই ভাবের ক্রিয়ারূপ পৃথক্ (যেমন--বিবৃতিমূলক :---I was = আমি ছিলাম ; অপেক্ষিত :--If I were = আমি যদি হতাম...)। এখানে জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বাংলার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। বাংলায় এই দুই ভাবের ক্রিয়ারূপের পার্থক্য নেই বললেই চলে।

তবে বাংলায় বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ অধিকাংশ সময়ই পৃথক্। যেমন—বিবৃতিমূলক :--সে চলে যায়। অনুজ্ঞা :--সে চলে যাক। অবশ্য বাংলায় কখনো কখনো বিবৃতিমূলক ক্রিয়ারূপই অনুজ্ঞাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

বিবৃতিমূলক : তুমি কলকাতা যাও, আমি যাই না।
অনুজ্ঞা : তুমি চলে যাও, বলছি।
বিবৃতিমূলক : তুমি কাল যাবে, শুনেছি।
অনুজ্ঞা : তুমি কাল যাবে, না গেলে আমি দেখে নেবো।

বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপের মধ্যে পার্থক্য বাংলায় যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেই, জার্মান ভাষাতেও তেমনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আছে। যেমন—বিবৃতিমূলক : du bist, অনুজ্ঞা : du sei। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। যেমন—বিবৃতিমূলক : ihr seid, অনুজ্ঞা : ihr seid। ইংরেজিতে বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ একই। ফরাসিতে ভাবপ্রকার জার্মানের মতোই তিনটি। তিনটি ভাবপ্রকারে ক্রিয়ার রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথক। যেমন—বিবৃতিমূলক : tu as = you have। অপেক্ষিত : tu aies = If you have। অনুজ্ঞা : aie। ফরাসিতে অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে কর্তা সর্বদা উহ্য থাকে—যেমন—Allez = চলে যাও। কিন্তু জার্মানে কর্তা উহ্য থাকে না, তবে কর্তার স্থান ক্রিয়ার পরে। যেমন— Gehen Sie! = চলে যাও!

বচন (Number) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের কোনো ভূমিকা নেই, কারণ বাংলায় একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ একই। যেমন—একবচন—আমি **যাই**, বহুবচন—আমরা **যাই**। এক্ষেত্রে প্রথমেই বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসিতে বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—সংস্কৃতে : একবচন—নরঃ গচ্ছতি = একজন লোক যায় ; দ্বিবচন—নরৌ গচ্ছত = দু'জন লোক যায় ; বহুবচন—নরাঃ গচ্ছন্তি = বহুলোক যায়। হিন্দিতে : একবচন—এক আদমি যাতা হ্যায় = একজন লোক যায় ; বহুচন—দশ আদমি যাতে হ্যাঁয় = দশজন লোক যায়। জার্মানে : Ich gehe = আমি যাই ; Wir gehen = আমরা যাই। ফরাসিতে : Je vais = আমি যাই, Nous allous = আমরা যাই।

এ ক্ষেত্রে বরং বাংলার সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে ইংরেজির। ইংরেজিতে কখনো কখনো শুধু প্রথম পুরুষে একবচন ও বহুবচনের ক্রিয়ারূপ পৃথক্। যেমন : একবচন—He goes। বহুবচন—They go। অন্য ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের রূপ একই। যেমন—I go, We go.

লিঙ্গ (Gender) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গেরও (Gender) কোনো প্রভাব একই। বাংলায় সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ নেই। যেমন—ছেলেরা যায়, মেয়েরা যায়। এখানে ক্রিয়ার রূপ 'যায়', উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। কিন্তু হিন্দিতে ক্রিয়ার রূপে লিঙ্গের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। হিন্দিতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—রাম পঢ়তা হ্যায় (পুং) ; সীতা পঢ়তী হ্যায় (স্ত্রী)। ফরাসিতে সর্বক্ষেত্রে নয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্গের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে : সাধারণ কথাবার্তায় গতিবোধক ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান ও সামান্য অতীত কালে

(simple past) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পৃথক্ হয়। যেমন—Je suis allé = আমি (পুং) গিয়েছি। Je suis allée = আমি (স্ত্রী) গিয়েছি। এখানে হিন্দি ও ফরাসি থেকে বাংলা ভাষার ক্রিয়ার রূপের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

পুরুষ (Person) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষ (Person)। উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person) ও প্রথম পুরুষে (Third Person) ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পৃথক্। যেমন : উত্তম পুরুষ—আমি **যাই**, মধ্যম পুরুষ—তুমি **যাও**, প্রথম পুরুষ —সে **যায়**। এক্ষেত্রে বাংলায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকারই বর্তেছে। সংস্কৃতে তিন পুরুষের ক্রিয়ার রূপ স্বতন্ত্র। আধুনিক ভাষা হিন্দি, ফরাসি ও জার্মানেও তিন পুরুষের ক্রিয়ারূপে পার্থক্য আছে। এই মূল নীতিতে সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

পুরুষ	বাংলা	সংস্কৃত	হিন্দি	জার্মান	ফরাসি
উত্তম	(আমি) যাই	গচ্ছামি	যাতা হুঁ	gehe	vais
মধ্যম	(তুমি) যাও	গচ্ছসি	যাতে হো	gehen	allez
প্রথম	(সে) যায়	গচ্ছতি	যাতা হায়	geht	va

অন্য দিকে লক্ষণীয় পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের এত পার্থক্য ইংরেজিতে হয় না। সব পুরুষে সেখানে ক্রিয়ার রূপ প্রায়ই এক। যেমন—I go, You go, I went, You went, He went। কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে পুরুষভেদে ক্রিয়ারূপের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যেমন—I go, কিন্তু He goes ; I am going, কিন্তু He is going ইত্যাদি। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের (person) যে প্রভাব সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গেই বাংলার সাদৃশ্য আছে ; ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য খুবই কম।

কাল (Tense) : বাংলায় ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ভূমিকা রয়েছে কালের (Tense)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ক্রিয়ার কাল গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত—সরল বা মৌলিক কাল (Simple/Primary Tense) এবং মিশ্র বা যৌগিক কাল (Compound Tense)। তাঁর মতে একটিমাত্র ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে যে কালের রূপ রচিত হয় তাকে সরল বা মৌলিক কাল বলা হয়। যেমন—আমি যাই। এখানে 'যাই' এই ক্রিয়া-রূপটিতে একটিমাত্র ধাতু আছে—'যা' ধাতু, এবং এই ধাতুর সঙ্গে 'ই' বিভক্তি যোগ করে এই ক্রিয়ারূপটি গঠন করা হয়েছে। বাংলা ক্রিয়ার সরল বা মৌলিক কাল চার প্রকার :

(১) সাধারণ (বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট) বর্তমান (Present Indefinite Tense)। যেমন—আমি করি।

(২) সাধারণ (বা অনির্দিষ্ট) অতীত (Past Indefinite Tense)। যেমন--আমি করলাম।

(৩) অভ্যাসগত বা নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)। যেমন--আমি করতাম।

(৪) সাধারণ (বা অনির্দিষ্ট) ভবিষ্যৎ (Future Indefinite Tense)। যেমন--আমি করব। ইত্যাদি।

আর যখন একাধিক ধাতুর সংযোগে একটিমাত্র ক্রিয়া গঠিত হয় তখন তাকে যৌগিক কাল (Compound Tense) বলে। যৌগিক কালে প্রথম ধাতুটির সঙ্গে '-তে' (~ ইতে) বা 'এ' (~ ইয়া) যোগ করে তার সঙ্গে 'আছ্' ধাতু বা 'থাক্' ধাতু যোগ করা হয় এবং সেই 'আছ্' ধাতু বা 'থাক্' ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কালবাচক ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করা হয়। অনেক সময় মূল ক্রিয়ার সঙ্গে '-তে' (ইতে) বা '-এ' (ইয়া) যোগ করা হয় না।

বাংলা ক্রিয়ার যৌগিক বা মিশ্রকালের রূপকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ক্রিয়ারূপগুলি হল এই রকম :

(১) ঘটমান বর্তমান—আমি করছি (< করিতেছি)।

(২) ঘটমান অতীত—আমি করছিলাম (< করিতেছিলাম)।

(৩) ঘটমান ভবিষ্যৎ—আমি করতে থাকবো (< করিতে থাকিব)।

(৪) পুরাঘটিত বর্তমান—আমি করেছি (< করিয়াছি)।

(৫) পুরাঘটিত অতীত—আমি করেছিলাম (< করিয়াছিলাম)

(৬) পুরাঘটিত ভবিষ্যত বা সম্ভাব্য অতীত—আমি করে থাকব (< করিয়া থাকিব)।

(৭) নিত্যবৃত্ত বর্তমান—আমি করে থাকি (< করিয়া থাকি)।

(৮) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান—আমি করতে থাকি (< করিতে থাকি)।

(৯) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত অথবা নিত্যবৃত্ত ঘটমান অতীত—আমি করতে থাকতাম (< করিতে থাকিতাম)।

(১০) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত—আমি করে থাকতাম (< করিয়া থাকিতাম)।

ভাষাচার্য শুধু উপর্যুক্ত চারটি সরল ও দশটি যৌগিক কালের উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাংলায় আরো দু'টি যৌগিক কালের ব্যবহার দেখা যায়--

(১) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান--আমি করে আসছি বা যাচ্ছি।

(২) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত—আমি করে আসছিলাম বা যাচ্ছিলাম।

• এই দুটি কাল 'আস্' ধাতু বা 'যা' ধাতু যোগে গঠিত।

যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কাল : আগে বাংলা ধাতুর গঠন প্রসঙ্গে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতুর (Compounded Root) গঠন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখানে যৌগিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। আর উপরে ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তাতে প্রচলিত ধারা অনুসারে যৌগিক কালের (Compound Tense) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয় তা প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সুকুমার সেনের উদ্ধৃতির সাহায্যে আগে তুলে ধরা যাক—

"যৌগিক ক্রিয়াপদের সঙ্গে যৌগিক কালের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যৌগিক কাল এবং যৌগিক ক্রিয়া দুই-ই দ্বিপদময় তবে পার্থক্য আছে, দুইটি বিষয়ে—(১) দুই অংশের যোগের মাত্রায় এবং (২) 'আছ' ধাতুর অর্থপ্রাধান্যে। যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে ফাঁক (Juncture) অনুভূত হয়, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থই প্রধান। যেমন—গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়া আছে (= পতিতঃ বর্ততে, ইংরেজি lies fallen)। যৌগিক কালে দুই অংশ বেমালুম জুড়িয়া যায়, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থ নিতান্তই অস্পষ্ট, ইহা উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সংযোজক (Copula) মাত্র। যেমন—গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়াছে (= পতিতঃ বৈদিক 'পপাত'—ইংরেজি has fallen।"[৬৩] এখানে যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা কতদূর গ্রহণীয় সেই বিষয়ে নানা কারণে প্রশ্ন জাগে। প্রথমত এখানে বলা হয়েছে যে, যৌগিক ক্রিয়ায় 'আছ' ধাতুর অর্থই প্রধান। কিন্তু ড. সেনই যৌগিক ক্রিয়ার যে প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন তাতে এমন সব ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন যাতে 'আছ্' ধাতুই নেই, সুতরাং তার অর্থ-প্রাধান্যও নেই। যেমন—মানা করে, বুঝান যায় না, খাইয়া লইল। এখানে ড. সেন নিজেই স্বীকার করেছেন—"দ্বিতীয় পদ সমাপিকা তবে "আছ্" ধাতুর নহে।"[৬৪] তাহলে এক্ষেত্রে যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের পূর্বোক্ত মানদণ্ডটি প্রযোজ্য হয় কি করে? দ্বিতীয়ত অধ্যাপক সেন আরো বলেছেন, "যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে ফাঁক (Juncture[৬৫]) অনুভূত হয়,"...(কিন্তু) "যৌগিক কালে দুই অংশ বেমালুম জুড়িয়া যায়।" আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যৌগিক কালের যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে এই অংশ দু'টি জুড়ে যায় না। যেমন—'সে যখন

৬৩। সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩১৪।

৬৪। তদেব, ৩১৬।

৬৫। এখানে আরো লক্ষণীয়, Juncture বলতে ভাষাবিজ্ঞানে সর্বদা ফাঁক বোঝায় না।

নিজের কথা বলিতে থাকিবে, তাহাকে বাধা দিও না' (ঘটমান ভবিষ্যৎ), 'বোধ হয় অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবে'—রবীন্দ্রনাথ। (পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত) ইত্যাদি।[৬৬]

বস্তুত ড. সুকুমার সেন যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন সেই পার্থক্যটি দেখানোই নিষ্প্রয়োজন। যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার ধারণাটি দু'টি স্বতন্ত্র মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে পার্থক্য করাই অবান্তর। যেমন—ফর্সা মানুষ ও লম্বা মানুষ—এই দু'টি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, কারণ ফর্সার বোধটি 'বর্ণ' বা 'রঙে'র মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত আর 'লম্বা'র বোধটি দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে কোনো একটি মানদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত দু'টি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—রঙের মানদণ্ডে ফর্সা ও কালো লোকের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়। আবার দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডে লম্বা ও বেঁটে লোকের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়। তেমনি ক্রিয়ার ধাতুগত গঠনের মানদণ্ডে পার্থক্য দেখানো যায় মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে, আবার কালগত চেতনার মানদণ্ডে পার্থক্য দেখানো যায় মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে। কিন্তু যৌগিক কালের সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য দেখানোর উপযোগিতা নেই। কারণ এতে পার্থক্যের দু'টি পৃথক্ মানদণ্ড—গঠন ও কাল—একসঙ্গে গুলিয়ে যায়। যেমন একই লোক লম্বা ও ফর্সা দুই-ই হতে পারে, তেমনি একই উদাহরণ যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রে পড়তে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিবেচ্য। ধাতুগত গঠনের দিক থেকে বাংলা ক্রিয়াকে মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করার যৌক্তিকতা আছে। যে ক্রিয়া একটি মাত্র ধাতুতে গঠিত তাকে মৌলিক ক্রিয়া এবং যে ক্রিয়া একাধিক ধাতুতে গঠিত অথচ একটিমাত্র কাজের অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে পার্থক্যটা কি? যে ক্রিয়ায় একটিমাত্র ক্রিয়ারূপ থাকে ও একটিমাত্র কালের অর্থ প্রকাশ পায় তাকে সরল কাল বলা হয়। কিন্তু যৌগিক কাল? তাহলে কি যে ক্রিয়ায় একাধিক কালের ক্রিয়ারূপ থাকে এবং একটিমাত্র কালের অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক কাল বলে? কিন্তু সে রকম তো কোনো রূপই নেই। 'সে করছে' (কিংবা সে করিতেছে)--বাক্যের 'করছে' (বা করিতেছে) ক্রিয়ায় কি দু'টি কালের ক্রিয়ারূপ ভিন্ন আকারে পাওয়া যায়? যদি না পাওয়া যায় তো যৌগিক

৬৬। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার : 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ১৯৭১, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

কাল নামকরণের তাৎপর্য কি? বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল—এই দু'টি বিভাগের উপযোগিতা আধুনিক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা প্রথমে বাংলা ক্রিয়াকেই দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—একপদী ক্রিয়া ও বহুপদী ক্রিয়া। যে ক্রিয়া একপদে গঠিত তাকে একপদী ক্রিয়া ও যে ক্রিয়া একাধিক পদে গঠিত তাকে বহুপদী ক্রিয়া বলতে পারি। বলা বাহুল্য, মৌলিক ক্রিয়া একপদী ক্রিয়া। আর যাকে যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপ বলা হয়েছে (যেমন—পড়েছে, করেছে) তাও একপদী ক্রিয়ারূপই। আর যাকে আগে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়েছে তা বহুপদী ক্রিয়ারূপ। যেমন—গান করে, মানা করে, খেয়ে ফেলল, পড়ে আছে ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করার আছে যে, যে দু'টি পদে একটি যৌগিক ক্রিয়া গঠিত তার পূর্বপদটির রূপ কালভেদে পুরুষভেদে পরিবর্তিত হচ্ছে না, সুতরাং তার রূপভেদ বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য শুধু দ্বিতীয় পদের রূপভেদ। সেই দ্বিতীয় পদটি একটি স্বতন্ত্র ধাতুর সঙ্গে নিষ্পন্ন এবং তার যে রূপভেদ হচ্ছে তা মৌলিক ক্রিয়ারই মতো।

যেমন—

যৌগিক ক্রিয়া	মৌলিক ক্রিয়া
দিয়ে দিল	দিল
খেয়ে ফেলল	খেল

এখানে মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ক্রিয়ারূপের অর্থাৎ বিভক্তির কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং বাংলা ক্রিয়ার রূপবিচারে একপদী ক্রিয়া ও বহুপদী ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায় একপদী ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য অর্থাৎ বিভক্তিভেদ অনুসারে বাংলা ক্রিয়ার কাল হল দশটি :

(১) সাধারণ বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (Present Indefinite Tense)—
সে করে (কর্ + এ)

(২) ঘটমান বর্তমান (Present Continuous Tense)—
সে কোরেছে (কর্ ~ কোর্ + ছে)

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect Tense)—
সে কোরছে (কর্ ~ কোর্ + এছে)

(৪) সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite Tense)—
সে কোরবে (কর্ ~ কোর্ + বে)

(৫) সদ্য অতীত (Simple Past)—
সে কোরলো (কর্ ~ কোর্ + লো)

(৬) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)—
সে কোরতো (কর্ ~ কোর্ + তো)

(৭) ঘটমান অতীত (Past Continuous)—
সে কোরছিলো (কর্ ~ কোর্ + ছিলো)

(৮) পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)—
সে কোরেছিলো। (কর্ ~ কোর্ + এছিলো)।

আরো দু'টি রূপ আছে। সে দু'টি অনুজ্ঞা ভাবের (Imperative Mood) :

(৯) বর্তমান অনুজ্ঞা (Present Imperative)—
সে কোরুক (কর্ ~ কোর্ + উক), তুমি করো (কর্ + ও)।

(১০) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি কোরবে (কর্ ~ কোর্ + বে)।

লক্ষণীয় যে, এই শেষের রূপটি নির্দেশক ভাবের। সাধারণ ভবিষ্যতেরই মতো আরো একটি রূপ আছে সেটিও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। সেটি হল—তুমি কোরো (কর্ ~ কোর্ + ও)। একপদী ক্রিয়ার বিভক্তিগুলিই বহুপদী ক্রিয়াতে যুক্ত হয়। শুধু তাতে পূর্বপদ স্বরূপ আরো একটি ক্রিয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) যুক্ত হয়ে বহুপদী ক্রিয়ার অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করে। বাংলা বহুপদী ক্রিয়ার কালরূপগুলি হল :

(১) ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous)—
সে কোরতে থাকবে।

(২) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা সম্ভাব্য অতীত
(Future Perfect or Doubtful Past)—
সে কোরে থাকবে।

(৩) নিত্যবৃত্ত বর্তমান (Recurring Present)—
সে (প্রায়ই) কোরে থাকে।

(৪) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান (Habitual Present Continuous)—
সে কোরতে থাকে।

(৫) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past Continuous)—
সে কোরতে থাকত।

(৬) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত
(Habitual Past Perfect)—
সে কোরে থাকত।

(৭) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান (Present Perfect Continuous)—
আমি কোরে আসছি।

(৮) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত (Past Perfect Continuous)—
আমি কোরে আসছিলাম।

এগুলি ছাড়া বাংলায় **অসমাপিকা ক্রিয়ার** কয়েকটি রূপ আছে। যেমন—

(১) তুমর্থক ক্রিয়া (Infinite)—
কোরতে (করিতে) (কর্ ~ কোর্ + তে) (to do)
এ কাজ কোরতে অনেক টাকা লাগবে। তবু এটা আমাকে কোরতে হবে।

(২) পুরাঘটিত সংযোজক ক্রিয়া (Perfect Conjunctive)—
কোরে (কর্ ~ কোর্ + এ) (করিয়া) (having done)
এ কাজটা কোরে তুমি কলকাতা যাবে।

(৩) সর্তজ্ঞাপক সংযোজক ক্রিয়া (Conditional Conjunctive) কোরলে (করিলে) (if one does) (কর্ ~ কোর্ + লে)—আমি এটা কোরলে তুমিও কোরো। (অর্থাৎ আমি যদি করি তা হলে তুমিও কোরো)। এখানে অপেক্ষিত ভাবের (Subjunctive Mood) অর্থ জ্ঞাপিত হচ্ছে।

আর বাংলা **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** (Noun Infinitive/Gerund/Verbal Noun) গঠিত হয় প্রধানত দু'ভাবে—

(১) আ (~ওয়া), অন (~ওন), অনা (~না, ~ওনা), আনি (~উনি), ই প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—চট্ + আ = চটা, খা + ওয়া = খাওয়া, দা ~দি + না = দেনা, পা + ওনা = পাওনা (দেনাপাওনা), চল্ + অন = চলন, বাঁধ্ + উনি = বাঁধুনি, শুন্ + আনি = শুনানি ইত্যাদি।

ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Infinitive) গঠনের এই রীতির ক্ষেত্রে বাংলা হল সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সমধর্মী। সংস্কৃতে ধাতুর সঙ্গে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করা হয় (যেমন—গম্ + অনট্ = গমন)। জার্মানে ধাতুর সঙ্গে -en প্রত্যয় যোগ করা হয় (যেমন—sing + en = singen = গাওয়া)। আর ফরাসি ভাষায় ধাতুর সঙ্গে -er প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করা হয় (যেমন—chant + er = chanter = গান গাওয়া, port + er = porter = বহন করা, all + er = aller = যাওয়া)। অন্য দিকে দেখা যায় ইংরেজিতে ধাতুর সঙ্গে কোনো প্রত্যয় যোগ করে Infinitive-এর রূপটি গঠিত হয় না, ধাতুর আগে পুরঃসর্গ (preposition) 'to' বসিয়ে Infinitive-এর রূপটি গঠন করা হয় (যেমন—to go = যাওয়া)। এখানে তা হলে সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলার যেমন সাধর্ম্য আছে, ইংরেজি থেকে তেমনি পার্থক্য আছে। তবে gerund-এর রূপ রচনা ইংরেজিতে প্রত্যয় যোগেই হয়। যেমন—go + ing = going.

(২) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের (genitive case) বিভক্তি যোগ করার জন্যে অনেক সময় -'বা' (~ ইবা) প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য রচনা করা হয়। যেমন—যা + বা = যাবা ('যাবার বেলা হলে যেও চলে')।

কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়াও বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—'জ্যোতি দাদা কথা **বলতে** (কথা বলা) জানেন বটে।' বাংলা ক্রিয়ার কাল রচনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য ভাষার ক্রিয়ার কালরূপের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়ার কালবিভাগ অন্য ভাষার কাল বিভাগের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম। যেমন—বাংলায় ইংরেজির মতো নিত্য (অনির্দিষ্ট) বর্তমান ও ঘটমান বর্তমানের জন্যে পৃথক্ ক্রিয়ারূপ নির্দিষ্ট—'যাই' (I go), যাচ্ছি (I am going)। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষা থেকে এখানে বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় এই সাধারণ বর্তমান ও ঘটমান বর্তমান দু'টি মিলিয়ে একটি কাল—সংস্কৃতে লট্ (গচ্ছামি), জার্মানে Present Tense (gehe), ফরাসি ভাষায়ও Present Tense (vais)।

পুরাঘটিত বর্তমানও সংস্কৃতে পৃথক নেই, অতীতের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলায় ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমানের জন্যে স্বতন্ত্র রূপ প্রচলিত। যেমন বাংলায়—আমি গিয়েছি, ইংরেজিতে, I have gone, জার্মানে ich habe gegangen। কিন্তু সংস্কৃতে দু'টি মিলিয়ে একই রূপ (লঙ্)। যেমন—অহং অগচ্ছৎ। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়েও বাংলার কালবিভাগ সূক্ষ্ম। বাংলা ক্রিয়ার কালবিভাগের সূক্ষ্মতা আরো একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। অভ্যাসগত অতীতের জন্যে বাংলায় স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ (আমি যেতাম) রয়েছে, ইংরেজিতে স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ নেই বলে "used to" যোগ করে এর অর্থ প্রকাশ করা হয়.(I used to go)। একটিমাত্র ক্রিয়ারূপ দিয়ে এই অভ্যাসগত অতীতের অর্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেই বলে জার্মান, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সাধারণ অতীতের ক্রিয়ারূপ দিয়েই এর কাজ চালানো হয়। ফরাসি ভাষাতেও অভ্যাসগত অতীতের জন্যে স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ নেই বলে সেই ভাষায় ঘটমান অতীত (Imperfect) দিয়েই ঘটমান অতীত ও অভ্যাসগত অতীত দু'য়েরই কাজ চালানো হয়। যেমন—Andans = 'আমি যাচ্ছিলাম' এবং 'আমি যেতাম'। সুতরাং অভ্যাসগত অতীত বাংলার এমন এক বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ যার সমতুল্য রূপ অনেক ভাষাতেই নেই।

ইংরেজি থেকে বাংলার পার্থক্য রয়েছে Perfect Continuous Tense-এর ক্ষেত্রেও। ইংরেজিতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে Perfect

Continuous Tense-এর পৃথক্ রূপ আছে, বাংলায় নেই। যেমন—I have been doing. I had been doing. I shall have been doing. এগুলির মধ্যে প্রথম দু'টিকে আমি 'করে আসছি', 'করে আসছিলাম' রূপে অনুবাদ করা যায়, কিন্তু তৃতীয়টিকে খাঁটি বাংলা ক্রিয়ারূপ দিয়ে প্রকাশই করা যায় না।

ইংরেজির থেকে বাংলার আরও একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় 'আমি গেলাম' এবং 'আমি গিয়েছিলাম'—এই দুই বাক্যের মধ্যে কালচেতনার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আমরা জানি। কিন্তু ইংরেজিতে দু'টিকেই 'I went' রূপে যখন অনুবাদ করা হয় তখন বাংলার এই পার্থক্যটি তাতে ধরা পড়ে না। তেমনি ইংরেজির I went এবং I had gone-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্য বাংলাতেও সবসময় স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এই দু'টি বাক্যকে যথাক্রমে 'আমি গেলাম' এবং 'আমি গিয়েছিলাম' এইভাবে অনুবাদ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় I went অর্থেও 'আমি গিয়েছিলাম' ব্যবহার করা হয়।

জার্মান ভাষার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা আরো বেশি ধরা পড়ে। জার্মান ভাষায় মৌলিক কাল মাত্র তিনটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আর যৌগিক কাল মাত্র তিনটি—পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝাবার জন্যে জার্মানে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা হয়, শুধু ক্রিয়ারূপ দিয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝান যায় না। বাংলায় যেমন—'গেলাম' ও 'যেতাম'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটির জন্যে পৃথক্ ক্রিয়ারূপ আছে, জার্মানে তেমনটি নেই। ফরাসিতেও নেই।

উপসংহারে বলতে পারি, সাধারণত ধারণা হল যে, ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা ক্রিয়ার কাজটি কোন্ সময়ে ঘটেছে বা ঘটবে বোঝা যায় তা-ই হল ক্রিয়ার কাল। কিন্তু বাংলায় এখন প্রত্যেক কালের জন্যে সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পৃথক্ ক্রিয়ারূপ নেই ; কখনো কখনো একই ক্রিয়ারূপ প্রসঙ্গ-ভেদে বিভিন্ন সময়ের কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার বিভক্তিগুলি সবসময় সুনির্দিষ্ট কালের অর্থ বহন করে না। বিদেশি ভাষাতত্ত্ববিদ বাংলা ক্রিয়ারূপের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, শুধু সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলার বিভিন্ন কালের ক্রিয়ারূপগুলি সময়ের তাৎপর্য ("temporal semantic values") বহন

৬৭। Ferguson, Charles A. : 'The Basic Grammatical Categories of Bengali.' Proceedings 9th International Congress of Linguistics.

করে।[৬৭]

অনেক সময় যে ক্রিয়ারূপ যে সময়ের কাজ বোঝাবার জন্যে সাধারণত প্রচলিত সেটি সেই সময়ের কাজ না বুঝিয়ে অন্য সময়ের কাজকে বোঝায়। একে ক্রিয়ার কালের তির্যক্ ব্যবহার বলা যায়। যেমন—'আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি।'—এখানে 'যাচ্ছি' ক্রিয়াটি ঘটমান কালকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা বলি—'তুমি কবে বিলেত যাচ্ছো?' 'আমি কালই চলে যাচ্ছি।'—তখন 'যাচ্ছি' ক্রিয়াতে বর্তমানের কাজ বোঝাচ্ছে না, আগামীকালের অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বোঝাচ্ছে। বাংলায় যেমন কারক-বিভক্তির তির্যক্ ব্যবহার বহুপ্রচলিত হয়েছে, তেমনি ক্রিয়ার কালবিভক্তিরও তির্যক্ ব্যবহার বহুপ্রচলিত হয়েছে। ক্রিয়ার কালবিভক্তির তির্যক্ প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

অতীত অর্থে সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়ারূপ—

১৮৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

ভবিষ্যৎ অর্থে বর্তমানের ক্রিয়ারূপ—

তুমি কবে কলকাতা যাচ্ছো?

বর্তমান অর্থে অতীতের ক্রিয়ারূপ—

আমি বলছিলাম যে এ মাসে টাকাটা কি না দিলে চলবে না?

অতীত অর্থে ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ—

কলকাতা থেকে কখন এলে?

এই আসছি (অর্থাৎ এই এলাম)।

পুরাঘটিত বর্তমান অর্থে সদ্য অতীত—

আমার কথাটা বুঝলে তো? (অর্থাৎ বুঝতে পেরেছো?)

এইসব তির্যক্ প্রয়োগ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলায় ক্রিয়ার কাল-বিভক্তির সঙ্গে সময়ের চেতনার (temporal sense) যোগটি ক্রমশ ছিন্ন হয়ে আসছে এবং বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপ ক্রমশ গঠনগত শৈথিল্য লাভ করছে। পূর্বে কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রেও এরকম তির্যক্ প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অনেক বিভক্তি লোপের দৃষ্টান্তও আমরা পেয়েছি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক আধুনিক ভাষার মতো বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বেও ক্রমশ সংশ্লেষণাত্মক গঠন থেকে বিশ্লেষণাত্মক গঠনের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।